KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩নং হরিতকি বাগান লেন, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5"x6"
Vol. & Number : 4/6-7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12	Year of Publication : আশ্বিন-কার্তিক ১৩২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৪ পৌষ ১৩২৪ ফাল্গুন ১৩২৪ চৈত্র ১৩২৪
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

বেহিসাবের নিকাশ।

—:০:—

সুখস্পৃহা জীবের পক্ষে যতই স্বাভাবিক হোক না কেন, সঞ্চয়-প্রবৃত্তি মানুষের সহজ কিনা—সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। উক্ত প্রবৃত্তির প্রচারকল্পে পণ্ডিতেরা যখন মধুমক্ষিকা আর পিপীলিকার দৃষ্টান্ত দিয়ে বিমুখ বা সন্দিগ্ধ মনকে অনুপ্রাণিত করতে প্রয়াস পান তখন সঞ্চয়ী লোকের হুল এবং বিষ সম্বন্ধেও কারো কারো মনে স্বতঃই একটা অনুসন্ধিৎসা জেগে ওঠে।

প্রাণিজগতের ঐ সব স্বভাব-সঞ্চয়ী অধিবাসীবৃন্দের পদমর্য্যাদা মানুষের চেয়ে এত বেশী, আর তাদের সঙ্গে আমাদের প্রকৃতিগত এতই বৈষম্য যে, তাদের সংস্কারগত সঞ্চয়পটুতার অনুকরণপ্রয়াসে আমাদের পক্ষে সম্যক সফল-কাম হবার সম্ভাবনা অতি কম! জন্মান্তরীণ সংস্কারের বশে যদিই বা কেউ এ কার্য্যে কতকটা সফলতা লাভ করতে সমর্থ হন, তা হলেও সমাজের দিক দিয়ে তার মূল্য যে কেমনতর, আর কতটা—তা নিয়ে তর্ক উঠ্‌বার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রয়েছে! হুলের ঘা মধুর প্রলেপে সারে কিনা—সমাজ-বৈদ্যগণ এখনও তা ঠিক করে উঠ্‌তে পারেন নি। সেইজন্যেই হয়ত এবেলা ওবেলা তাঁদের ব্যবস্থা বদ্‌লাচ্ছে। কখনো পিঠে হাত বুলিয়ে শিখাচ্ছেন—"সঞ্চয়ী লোক সুখে থাকে", আবার পরক্ষণেই কানে পাক দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন—"অর্থই অনর্থের মূল! "সভাপর্ব্বের"

পরে "বনপর্ব্বের" অবতারণা করছেন ;—"অশ্বমেধের" ঘটার পরে "স্বর্গারোহণের" অন্তর্জলীর ব্যবস্থা দিচ্ছেন !

এই সব অব্যবস্থিততা এবং অনবস্থিতি দেখে শুনে পণ্ডিতেরা সুখদুঃখময় সংসারটাকে চাকার সাথে উপমিত করে' নানান্ ভাষায় নানান্ ছাঁদে যে সব দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন, বলা বাহুল্য, মীমাংসা তাতে কিছুই এগোয় নি—বরং পিছিয়েছে। অপণ্ডিতেরা তর্ক তুলছে—চাকাই বা হতে গেল কেন ? নৌকাও ত হতে পারত ! তাহলে ত গড়্‌গড়িয়ে না গিয়ে দিব্যি তর্‌তরিয়ে সর্‌সরিয়ে চল্‌ত ! দুঃখের ধূলা-কাদায় অমন নাস্তানাবুদ হয়ত হত না !

মানুষের মনে সঞ্চয়-প্রবৃত্তিটীর আরোপ নিশ্চয়ই আদিযুগের কোনো এক বিশ্বামিত্রের কাজ। এতে যদি ঈশ্বরের হাত থাক্‌ত তাহলে কি যুগে যুগে দেশে দেশে তাঁর যে সব ওয়ারীশ বা সরিক অবতীর্ণ হয়ে তাঁদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠিত করে গেছেন—তাঁরা এর পরে এত বিরক্তি দেখাতে পারতেন ? মহর্ষির অভিপ্রায় সম্ভবতঃ মন্দ ছিল না ! কিন্তু যা শাশ্বত নয় কালের বশে তার প্রয়োজনের পরিবর্ত্তন হবেই হবে ! সভ্যতার উন্মেষ-উষায় যখন শীতের কাপড়ের চেয়ে শীতের কাঁপুনি অনেক গুণে বেশী ছিল—তখনকার দিনের রোদে পিঠ দিয়ে বসার সার্থকতা এখনকার সামাজিক মধ্যাহ্নে আর ত নেই ! তাতে এখন শুধু স্বাস্থ্যহানি আর বর্ণকালিই সার হবে ! এখন এই দীপ্ত মধ্যাহ্নে "সঞ্চয়ী লোক সুখে থাকে" এ মন্ত্রের পরিবর্ত্তন করে এমন কোনো মন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে যাতে এই প্রখর রশ্মিজ্বালা প্রত্যাহত হয়ে মৃদু আলোকমালায় পরিণত হতে পারে !

(২)

ভবিষ্যতের চিন্তা মানুষের পক্ষে অপরিহার্য্য, এবং সেদিক দিয়ে দেখতে গেলে ভবিষ্যতের জন্যে সংস্থান-প্রয়াসও যে অবশ্যকরণীয় সে বিষয়ে ত কোনো প্রশ্নই উঠ্‌তে পারে না ! কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে সঞ্চয়-প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিলেই যে উক্ত সামাজিক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে—এমন মনে না করবারও যথেষ্ট হেতু রয়েছে ! আমরা প্রত্যেকেই যদি নিজের নিজের কোলে ঝোল টান্‌তে সুরু করি তাহলে, খুব সম্ভব, ঝোলে অচিরেই টান পড়বে। কারণ, বর্ত্তমানের ক্ষিদের চেয়ে ভবিষ্যতের লোভ অনেক বেশী। প্রত্যেকেই যদি আমরা স্বতন্ত্রভাবে আমাদের অন্ধকার ভবিষ্যৎকে রূপচাঁদের আভায় ফুট্‌ফুটে কর্‌তে প্রয়াস পাই তাহলে অনেকের ভাগ্যেই চিরকাল সর্‌ষের ফুল দর্শন অনিবার্য্য হয়ে উঠ্‌বে। কারণ সঞ্চয়ের প্রবৃত্তি এবং সুযোগের সম্মিলন আমাদের ভিতরে যাঁর ভাগ্যে জুটবে উক্ত লোভনীয় কার্য্যে "ইতি" দেবার প্রয়োজনীয়তা কখনো তিনি অনুভব কর্‌বেন না।

বর্ত্তমানের সম্ভোগ যতই বেহিসাবী হোক না তার একটা সীমা থাকবেই—পেটুকের পেট না ভরলেও তার চোয়াল ধরবে—কিন্তু ভবিষ্যতের সঞ্চয় হচ্ছে অনেকটা অদৃষ্টকে শৃঙ্খলিত করবার চেষ্টা ; পুরুষপরম্পরাক্রমে করলেও কোনো দিনও তার পরিসমাপ্তির সম্ভাবনা নেই।

ব্যক্তিবিশেষের অপরিমিত অর্থসঞ্চয়-চেষ্টা যে জাতীয় ধনভাণ্ডার হতে চুরির প্রয়াস সে কথা একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে। সমাজের ডালপালা ছেঁটে, তার গলা চেঁচে সঞ্চয়ের হাঁড়ি ঝুলিয়ে দিলে

অনতিবিলম্বেই যে তা তাড়ি হয়ে উঠ্‌বে—সে ত অতি সুনিশ্চিত! হয়েছেও তাই! এ সামাজিক অকল্যাণ দূর কর্‌তে হলে ব্যক্তিগত জীবনকে তথাকথিত সঞ্চয়ের নেশা থেকে মুক্ত রাখা একান্ত প্রয়োজন। যত দিন না সঞ্চয়-প্রবৃত্তির একটা নবতর সংস্করণ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে ততদিন "সঞ্চয়ী লোক সুখে থাকে" আর "চুরিবিদ্যা বড়বিদ্যা" এ দুটী কথায় সময়ে সময়ে বিশেষ কোনোই তফাৎ থাকবে না!

অনেক সময়ে শুন্‌তে পাওয়া যায় মানুষের মনে সঞ্চয়-প্রবৃত্তির আধিক্যের ফলেই শিল্প, বাণিজ্য, রাষ্ট্র আদি করে সর্ব্ব বিষয়েই মানুষ আজ এত উন্নত। একথা ঠিক নয়! পারিপার্শ্বিককে ছাড়িয়ে উঠবার একটা সহজ প্রেরণা জীবমাত্রেরই ভিতরে আছে। ঈশ্বরেচ্ছায় মানুষেতে এর চরম অভিব্যক্তি ঘটেছে। তারি উন্মাদনাতেই মানুষ নিজের মনুষ্যত্ব সব দিক দিয়ে প্রতিপন্ন না করে' স্থির থাক্‌তে পারে নি! মানব-সভ্যতার বস্তু আর ছন্দ দুইই নিতান্ত বেহিসাবের মধ্যে দিয়ে গড়ে উঠেছে। হিসাব মাঝে মাঝে তাতে সুর যোজনা করেছে মাত্র। (আর তা যে অধিকাংশ স্থলেই বেসুরো বাজ্‌ছে—সে কথা বুঝতে হলে হিসাবের কানমলা থেকে কান বাঁচিয়ে চলা নিতান্ত দরকার)—মানুষের স্বাভাবিক চয়ন-লীলার পরে একটা সুদীর্ঘ ষট্‌পদী হিসাবের উপসর্গ চেপেই সঞ্চয়লোলুপতার সৃষ্টি করেছে। চড়নদারকে ঘোড়ার মালিক বলে' মনে কর্‌লে অনেক সময়েই ভুলের সম্ভাবনা থাকে—এ ক্ষেত্রেও আমাদের তাই হয়েছে।

সঞ্চয়ের ধর্ম্মই হচ্ছে বর্ত্তমানের বিকাশ এবং ব্যাপ্তির যে মূল্য, যে পাথেয় তাই জমিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে পথ্যের সংস্থান। এ যেন

শিশুর অষ্টকড়াই থেকে খই চিড়ে তার ভাবী শ্মশান-বন্ধুদের জন্যে তুলে রাখবার ব্যবস্থা। বলা বাহুল্য, এমন হিসাবী অভিভাবকের হাতে পড়লে সমাজ-শিশুর ভবিষ্যৎ একটুও আশাপ্রদ হত না। কিন্তু সুখের বিষয় তা পড়ে নি। হিসাবী লোক কি কখনো "ঘরের খেয়ে বনের মহিষ" নিরর্থক তাড়াতে যায়? পুষ্করিণীর মৎস্য তার চেয়ে ঢের বেশী উপাদেয় এবং নিরাপদও বটে। আশু চক্রবৃদ্ধির আশা না থাক্‌লে হিসাবী লোক কোনো কাজে হস্তক্ষেপ করা যুক্তিযুক্ত মনে করে না। এমন কি রাঁধা-মাছ মার্‌তে পার্‌লে পুকুরের ধারেও যেতে চায় না। কাজেই এ হেন হিসাবী-তথা-সঞ্চয়ী লোকের কর্ম্ম-প্রচেষ্টার ফলেই মানব-সভ্যতার বিকাশ হয়েছে একথা অনেকটা কাকের ডাকাডাকিতেই ভোর এসেছে বলার মতই সুসঙ্গত।

(৩)

মানব-সভ্যতাটা অভাবের তাড়নায় গড়ে ওঠে নি—ওবস্তু স্বভাবের-প্রেরণাতেই ফুটে উঠেছে। অভাবই যদি কর্ম্মের পক্ষে যথেষ্ট উদ্দীপনা হ'তো তা' হ'লে খুব সম্ভব হাঁসেরা আজ পুকুর কাটতে শিখত; গরুরা কেবলি জাবর না কেটে মাঝে মাঝে আঁটি আঁটি ঘাসও হয়ত কাট্‌ত—আরো কত কি হ'তো! কিন্তু তা হয় নি—কারণ, ইতর জীবের অভাবের তাড়নার তুলনায় স্বভাবের প্রেরণা নিতান্তই অস্পষ্ট!—আর মানুষের অনেকটা তার বিপরীত। মানুষ শুধু অভাব মেটায় না নূতন নূতন সৃষ্টিও করে। এমন ধারা সৃষ্টি কার্য্যে তার যে খরচ তা' যে নিতান্তই বেহিসাবের বাজে খরচ সে কথা অস্বীকার করা চলে না!

মানব-সভ্যতার নব নব বিকাশশীলতা, নিত্যনব উদ্ভাবনপ্রবণতা ত' চিরদিনই এস্নিধারা বেহিসাবের অমৃতে অভিষিক্ত হয়ে আস্‌ছে। হিসাবের উচ্ছিষ্টে নিশ্চয়ই তার পুষ্টি হয় নাই। ব্যক্তিগত হিসাব-প্রবৃত্তি আর সহজ সামাজিক বেহিসাবের দ্বন্দ্বে যখন হিসাব জয়ী হয়—মানুষের মনুষ্যত্ব স্বতঃই মলিন হয়ে পড়ে।—প্রাথমিক-শিক্ষার অবাধ প্রচলনের প্রস্তাবের সাথে সাথেই তখন চাকর মজুরের সম্ভাবিত দুর্ম্মূল্যতার আর রায়েত-জনের অবশ্যম্ভাবী অবাধ্যতার আশঙ্কা আসে। হিসার ত' চিরদিনই সমাজের পকেট সংস্করণের জন্যেই আগ্রহ দেখিয়েছে।—সমাজের কপালে রাজার টীকা সে ত' বেহিসাবেরই আঙ্গুল-কাটা রক্তের টিপ্!

বেহিসাবের আতিশয্যের উত্তেজনায় যদি কেউ আঙ্গুল না কেটে নিজের গলাও কেটে বসে তাতে তার ব্যক্তিগত যতই ক্ষতি হোক না, সমাজের উন্নতি-স্রোতে তা' জলবিম্বের মতই নির্ব্বিবাদে মিশে যাবে। আর, বেহিসাবের প্রতি বীতরাগ হয়ে সমাজে যদি কেবলি সঞ্চয়-প্রবৃত্তির বীজ বপনের কাজ চল্‌তে থাকে তা' হ'লে খুব সম্ভব অদূর ভবিষ্যতে অনেকেই নিজের আঙ্গুল নিরাপদ কর্‌তে পরের গলায় ছুরি বসাবে। হত্যা আর আত্মহত্যা এতদুভয়ের কোনোটিই বরণীয় না হ'লেও দুটীই সমান দূষণীয় নয়। বেহিসাবের অবিবেচনার প্রশমন কল্পে সমাজে সঞ্চয়ের কার্পণ্যের পোষকতা কখনো পরিণামদর্শিতার পরিচায়ক বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে না। অমিতব্যয়ী বেহিসাবীর যে দণ্ড তা' সেই বহন করে থাকে; আর অপরিমিত সঞ্চয়-লালসার নৈতিক আর্থিক পারমার্থিক সর্ব্ববিধ প্রায়শ্চিত্ত সমাজের ছোট বড় মাঝারি সবাইকেই কর্‌তে হয়!

তবু মানুষের সঞ্চয়ের নেশা ঘোচে না। নেশার ধরনই নাকি ঐ! নেশার ঝোঁকে মানুষ যখন পদে পদে ভূমিসাৎ-ড্রেনজাৎ হতে থাকে তখন তার সন্দেহ হয়—পৃথিবীর ভারকেন্দ্রের অচলতায় আর রাস্তার ধারের ঐ ড্রেনগুলোর স্থিতিশীলতায়।—এ ক্ষেত্রেও আমাদের তাই হয়েছে সংসারের বিকৃতিটাকেই আমরা তার প্রকৃতি বলে ধরে নিয়ে "জীবন এমন ভ্রম আগে কে জানিতরে" তারপরে ইত্যাকার সব করুণ সুরের সারি-গা-মা সাধ্‌ছি!—উচিত আমাদের জমাখরচের খাতা পুড়িয়ে ফেলে বেহিসাবের তরফ থেকে অর্থনীতি-শাস্ত্রের "পরিশোধিত সংস্করণ" বের করা।

মাঘ ১৩২৪। শ্রীবরদা চরণ গুপ্ত।

জাতীয়জীবনে সাহিত্যের উপযোগীতা।

(১)

নানা রকমের খেল্‌না সংগ্রহ করে শিশুরা বড় ঘরবাড়ীর বড় সংসারটির ভিতর তাদের আপ্‌নার ছোট্ট একটি সংসার পেতে বসে। সেইখানে তাদের পূরো স্বাধীনতা। বৃহৎ একটি সংসারের অভিজ্ঞতার উপর তাদের ক্ষুদ্র সংসারটির প্রতিষ্ঠা বটে; কিন্তু মোটেই তার শাসনাধীন নয়। সে সংসার তাদের আপনার সৃষ্টি। তার মূলে আছে তাদের শিশু-অন্তরের স্বাধীন কল্পনা।

মানুষ তেমনি ভগবানের সৃষ্টির মাঝখানে আপনার একটি পৃথক সৃষ্টি গড়ে তুলেছে। মানুষের মনুষ্যত্ব তার ঐ আপনার সৃষ্টিতে। আর ঐখানেই মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতা। মানুষের সৃষ্টির মূলে যদিও বিশ্বপ্রকৃতির অভিজ্ঞতা আছে, প্রকৃতির শাসন সে সৃষ্টি মানে না। সে সৃষ্টির বীজ-কোষ মানুষের আপনার স্বাধীন ইচ্ছা এবং স্বাধীন চিন্তা।

বিশ্বসৃষ্টির সঙ্গে মানুষের সৃষ্টির একটি জায়গায় বেশ একটা মিল দেখা যায়। উভয় সৃষ্টিরই বাইরের একটা রূপ আছে, আর সে রূপের আড়ালে আছে একটা অরূপ শক্তি। বিশ্ব-সৃষ্টির বাইরের রূপ হচ্ছে বিশ্ব-বস্তু, আর তার আড়ালে আছে বিশ্ব-শক্তি। মানুষের সৃষ্টির রূপের পরিচয় মানব-জাতির সভ্যতার বাইরের নিদর্শনগুলোতে, আর সে সৃষ্টির অন্তরের যে শক্তি, সেটা হচ্ছে মানব-মনের চিন্তার ধারা।

ঐ চিন্তার ধারা,—বিশ্বমানব-মনের চিন্তার ধারাই মানুষের সাহিত্য। সাহিত্যের উপরই জাতীয়জীবনের প্রতিষ্ঠা; কেননা প্রত্যেক জাতির নূতন নূতন সৃষ্টিই জাতীয়জীবনের গতি এবং সমৃদ্ধির পরিচয়। ঐ সৃষ্টির ভিতরেই জাতির প্রাণের স্পন্দন।

মানুষের দেহটা যখন প্রাণশূন্য হয়ে পড়ে, ভিতরের একটা বিষাক্ত বাষ্পে মুহূর্ত্তের মধ্যে তার বিকৃতি ঘটে। ঐ দূষিত বাষ্প জাতির-অন্তরেও জমে ওঠে, যখন জাতীয় মনের যে চিন্তার ধারা জাতির সাহিত্যে প্রবাহিত হয় তার গতি-বেগ প্রবল এবং অপ্রতিহত না থাকে। গতিই ত প্রাণ। গতি প্রতিহত হলেই প্রাণ বিনষ্ট হয়।

বিষাক্ত বাষ্পের উদ্ভব জীবন্ত দেহেও ঘটে, কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ রক্ত-স্রোত বিশুদ্ধ রাখ্‌বার জন্য একটি অন্তর-অঙ্গ সর্ব্বদাই নিযুক্ত থাকে। যে রক্ত-স্রোত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শিরা-উপশিরায় সঞ্চালিত হয়ে ক্ষণে ক্ষণে দূষিত হয়ে ওঠে; দেহের ঐ অন্তর-অঙ্গটি বাইরের উপাদান এনে প্রতিমুহূর্ত্তে সেই দূষিত রক্ত-ধারাকে শোধন করে। সাহিত্য-প্রতিভা জীবন্ত-জাতিদেহের ঐ রকমের একটি অন্তর-অঙ্গ বিশেষ। বিশ্ব-মনের সঙ্গে জাতীয় মনের যে একটা যোগ আছে বা থাকা দরকার, তা থেকে বিচ্ছিন্ন হলেই, সে জাতীয় মনের বদ্ধ আব্‌হাওয়া বিষিয়ে ওঠে। তখন প্রতিভাবান সাহিত্যিকেরাই সে জাতির অন্তরে বাইরের বিশুদ্ধ হাওয়া সঞ্চারিত করে জাতির জীবন রক্ষা করে। সাহিত্যিকেরাই জাতীয় রোগের প্রকৃত চিকিৎসক।

রোগ-চিকিৎসার একটা নূতন পদ্ধতি আমরা একালে দেখ্‌তে পাচ্ছি। ঐ নূতন প্রণালীতে যাঁরা চিকিৎসা করেন, তাঁদের মূল মন্ত্রটি হচ্ছে এই,—If you think diseased thoughts you attract disease, if

you think healthy thoughts you attract health. এঁরা দেহটাকে ছেড়ে দিয়ে দেহীকেই ধরে বসেন। এঁদের কথা, রোগের যে সব লক্ষণ মানুষের শরীরে প্রকাশ পায়, সেগুলো মনের রোগেরই বাইরের রূপ। এই কারণে চিকিৎসক সম্মোহন-বিদ্যার (hypnotism) বলে রোগীকে যাদু করে তার মন থেকে রোগ-বিভীষিকা তাড়িয়ে স্বাস্থ্যপ্রদ মনোভাব তার অন্তরে সঞ্চারিত করেন। এই প্রণালীর চিকিৎসা ব্যক্তির পক্ষে কতদূর ফলদায়ক তা ঠিক বল্‌তে পারিনে। কিন্তু এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, জাতীয়রোগের চিকিৎসার ঐ একমাত্র পদ্ধতি। জাতীয়জীবনে যখন নানা রকমের বিকৃতি-বীভৎসতা দেখা দেয়, তখন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা বিচক্ষণ চিকিৎসকেরই মত বিচিত্র সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির দ্বারা সমগ্র জাতীয়মনকে মুগ্ধ করে জাতির অন্তরে আপনার স্বাস্থ্যপ্রদ মনোভাবসকল সঞ্চালিত করতে এবং সমস্ত জাতিকে নব নব উচ্চতর আদর্শে গড়ে তুল্‌তে সমর্থ হন। আপনার মনের চিন্তাধারা সমস্ত জাতির অন্তরে প্রবাহিত করতে সাহিত্যিক যে রীতিটি অবলম্বন করেন, সেইটি হচ্ছে সাহিত্যের আর্ট। জাতীয়-জীবনের উপর সাহিত্যের আর্ট-বস্তুটির প্রভাব কতটা, এবং আর্টের সাহায্যে জাতীয়জীবনের কতদূর উৎকর্ষ-সাধন হয়েছে, সে আলোচনার পূর্ব্বে, আর্টের পরিচয় কি, তার সম্বন্ধে দু'একটি কথা বলা যা'ক।

ভিন্ন ভিন্ন সাহিত্যসমালোচক আর্ট সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন, তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই তিনটি,—জীবনের ব্যাখ্যা, The interpretation of life; জীবনের আলোচনা, The criticism of life; এবং জীবনের নব নব বিকাশ, The expression of life.

আর্টের একটি সার্থকতা তাহলে এই যে, তাতে আমরা দেখি, নব নব রূপে জীবনের প্রকাশ, অর্থাৎ জীবনের নূতন আদর্শের সৃষ্টি। নূতন আদর্শের প্রয়োজনটা কি, সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা আবশ্যক। কালের শাসন যে কেবল মানুষের রক্তমাংসের দেহটাকে মেনে চল্‌তে হয়, তা নয়, কালের হুকুমে মানুষের পুরোণো মনোভাব-গুলোকেও নতুনের পথ থেকে সরে দাঁড়াতে হয়। আর মানুষের মনের আইডিয়া যখন বদ্‌লে যায়, তখন জীবনের আইডিয়ালের পরিবর্ত্তন বিশেষ আবশ্যক। কেননা, মানুষের মনের আইডিয়ার অনুরূপ তার জীবনের আইডিয়াল যদি না হয়, তার অন্তরে বাহিরে একটা বিরোধ ঘটে। মানুষ এ অবস্থাতে আপনাতে আপনার বিশ্বাস হারায় এবং অপরের সঙ্গে ব্যবহারে কপটতা করে। এমনি ভাবে নানা রকমের বিকৃতি তার প্রকৃতিতে ঘটে। এতে করে তার আত্মশক্তি দিন দিন হ্রাস হয়ে আসে। ব্যক্তি ও জাতি উভয়ের পক্ষে ঐ একই কথা, কেননা, ব্যক্তির সমষ্টি নিয়েই ত জাতি।

In the course of life, the outer and the inner remain in incessant conflict and one must therefore arm himself to maintain the ever-renewed struggle,—Goethe নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা দ্বারা এ কথাটি বুঝেছিলেন, এবং আপনার অন্তর-বাহিরের দ্বন্দ্ব নিষ্পত্তি করবার যে শক্তি তিনি নিজের জীবনে অর্জ্জন করেছিলেন, তাঁর সাহিত্যের ভিতর দিয়ে সমগ্র জর্ম্মাণ জাতিকে সেই শক্তি দান করে, জর্ম্মাণীর জাতীয়জীবনের অশেষ কল্যাণ সাধন তিনি করেছিলেন। Goethe-র জর্ম্মাণীতে জাতীয়জীবনের যে বিকৃতি ঘটেছিল, তার কারণ আইডিয়ার অভাব নয়, অশরীরী

আইডিয়ার জীবন্ত সাকার-মূর্ত্তির অভাব। নতুন নতুন আইডিয়াতে দেশের আকাশ ছেয়ে গিয়েছিল! কিন্তু জীবনের ক্ষেত্রে সেই আইডিয়াকে প্রয়োগের সময় জর্ম্মাণজাতির সঙ্কোচ এবং দুর্ব্বলতার অবধি ছিল না। ফরাসীদেশে নব ভাবের যে বান এসেছিল, তার তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস সে দেশের সীমানা অতিক্রম করে জর্ম্মাণীতে এসে পৌঁছেছিল। জর্ম্মাণ-দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকদের নূতন নূতন উদ্ভাবনের সঙ্গে সঙ্গে জাতির মনে একটা বিরাট পরিবর্ত্তন এসেছিল। জর্ম্মাণ-সমালোচকেরা পুরাতন আচার-বিচার, রীতি-নীতি-পদ্ধতির তীব্র সমালোচনা করতে সুরু করেছিল। নূতনের আক্রমণে জাতীয় মনের পুরাণো আইডিয়াগুলো অন্তর্হিত হয়েছিল। কিন্তু নূতন আদর্শের অভাবে জীবনের পুরাতন আদর্শের খোলসটা রয়েই গিয়েছিল। জাতির নবীন মন জীবনের পুরাতন আদর্শের বিধি-বিধানের শিকলে বাঁধা পড়েছিল। তাতে রুদ্ধগতি রক্তস্রোতের মত ঐ রুদ্ধমনের চিন্তাধারা দূষিত হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থা থেকে জর্ম্মাণজাতিকে রক্ষা করেন Goethe, Schiller, Heine প্রভৃতি সাহিত্যিকেরাই। তাঁরা এই নতুন আইডিয়াগুলোকে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা, আশ্চর্য্য স্পষ্টতা এবং অপূর্ব্ব মৌলিকতার সহিত সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত করেন। এঁরা নতুন নতুন ভাব নিয়ে জীবনের নূতন আদর্শ সৃষ্টি করে জর্ম্মাণ-জাতির সুমুখে খাড়া করেন। Goethe-র অধিকাংশ চরিত্রই ত নিরাকার আইডিয়ার জীবন্ত সাকার রূপ।

দর্শন বিজ্ঞানের নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের যে অভিব্যক্তি ঘটেছিল, তার অনুরূপ জীবনের নতুন আদর্শ যে জর্ম্মাণ-সাহিত্যে গড়ে উঠেছিল, সে সাহিত্য যে মঙ্গলের সৃষ্টি, তার

প্রমাণ Goethe-র এই বাক্যে,—It may now without arrogance be asserted that German Literature has effected much for humanity that a moral-psychological tendency pervades it, introducing not ascetic timidity, but a free culture with nature and in cheerful obedience to Law.

(৩)

একটি কারণ দেখানো গেল। নতুন ছাঁচে জীবনের আদর্শ গড়ে তোলবার প্রয়োজন আরো অনেক কারণে প্রত্যেক জাতির ভিতরেই দেখা যায়। পারিপার্শ্বিক ঘটনার সংঘাতে, অথবা ভিতরের অবস্থার পরিবর্ত্তনে, অনেক সময় জীবনের সনাতন পথটি রুদ্ধ হয়ে আসে, তখন জাতির কল্যাণ নতুন পথের সৃষ্টিতেই। কেননা, আত্মপ্রকাশের সহজ পথটি যখন নেই, তখন মানুষের পক্ষে চোরাগলির অনুসন্ধানে ফেরাটা বড় অস্বাভাবিক নয়। ঐ অবস্থাতে জাতির অন্তরে হীনতা এসে পড়ে। আর সেই হীনতা যাদের মন আছে তাদের মনকে পীড়া দেয়; মানুষের দুঃখ তাঁদের মনকে কষ্ট দেয়—কিন্তু তার চাইতে বেশী কষ্ট দেয় মানুষের অবনতি। প্রাণের ঐ বেদনা থেকেই সাহিত্যিকদের অন্তরে আসে সৃষ্টির তাগিদ। তাঁদের সৃষ্টি জাতির মঙ্গল সাধন করবেই, কেননা সে সৃষ্টির গোড়াতে আছে মায়ের প্রাণের মঙ্গল-কামনা।

যাঁদের অন্তরের সম্বল কেবল স্পর্দ্ধা, তাঁদের উপর সমাজের শাসন-ভারই অর্পিত হয়েছে, তাঁরা চান কেবল চোখ রাঙ্গিয়ে মানুষের

প্রাণটাকে দমন করতে। পরের দুঃখে তাঁদের অন্তরে ব্যথা বাজে না। বেদনা-বোধ তাঁদের নেই। অপরপক্ষে আত্মপ্রকাশের সনাতন পথগুলো রুদ্ধ হয়ে আসাতে, জাতির প্রাণটা যখন হাঁপিয়ে মরবার উপক্রম হয়, তখন যে মণীষীরা নতুন পথ গড়বার শ্রম স্বীকার করেন, সাহিত্যে যাঁরা জীবনের নতুন নতুন আদর্শ সৃষ্টি করেন, পরের দুঃখটা তাঁরা আপনারাই বোধ করেন। পরের অধোগতিতে তাঁরা নিজেদের অপদস্থ মনে করেন। সুতরাং তাঁদের সৃষ্ট সাহিত্য জাতীয় জীবনের হিতসাধন এবং জাতীয় মনের ঐশ্বর্য্যবর্দ্ধন যে করবে, এ ত ধরা কথা।

একটা উদাহরণের দ্বারা এ মতের সমর্থন করা যাক। য়ুরোপীয় সাহিত্যে জীবনের আইডিয়ালের একটা পরিচয় স্ত্রী-পুরুষের ভিতরে সখ্যভাবের (friendly comradeship) আদর্শে। যৌনসম্বন্ধ যখন এই নব আদর্শের প্রতিষ্ঠাভূমি নয়, তখন দেহের আকর্ষণ এই মিলনের কারণ হতে পারে না। মনের শক্তি সৌন্দর্য্যের আকর্ষণে মানব-মনের সঙ্গে মানব-মনের মিলনই হচ্ছে এই নব আদর্শের ভিত্তি। এখন এই আদর্শের কি প্রয়োজন, এবং এতে করে জাতীয় জীবনের কোন্ কল্যাণ সাধিত হয়েছে, তার সম্যক আলোচনা করবার সামর্থ্য আমার অবশ্য নেই, তবে মোটামুটি দু' চারটি কথা বলতে পারব, এ ভরসা আছে।

মানব-প্রকৃতি জড়-প্রকৃতির নিয়মাধীন, এই সিদ্ধান্তে আস্থাবান একজন জর্ম্মাণ জড়বাদী স্ত্রী-পুরুষের ভিতর যে প্রণয়, তাকে বিশ্লিষ্ট করে দেখিয়েছেন, অণু-পরমাণুতে যে কারণে রাসায়নিক যোগ সংঘটন হয়, ঐ প্রণয়ের মূলে সেই একই কারণ বর্ত্তমান। জর্ম্মাণ পণ্ডিতের মতটি আমি অগ্রাহ্য করিনে। কিন্তু এখানে আমার বলবার কথা এই

ভাস্কর তাঁর যে মানসী মূর্ত্তি পাথর খুদে বের করলেন, তার দিকে আমরা যখন চাই, পাথরটাই কি তার ভিতর আমাদের কাছে সত্য-বস্তু বলে মনে হয়, না ভাস্করের কল্পনাই সেখানে সত্যরূপ ধারণ করে? স্ত্রী-পুরুষের যে প্রণয়, তার মূলে যাই থাক, বর্ত্তমানে তার শোভা-সৌন্দর্য্য, ঐশ্বর্য্য-সম্পদ মানুষের মনের ক্রিয়ারই ফল। মূলে যার সৌন্দর্য্যের অভাব তাকে সুন্দর শোভন করে তুলবে, এ সামর্থ্য সাহিত্যের আছে। আমাদের ভিতর যেটা কুৎসিৎ, সেটাকে শ্রীযুক্ত করবার ভার সাহিত্যের উপরই ন্যস্ত। কারণ সাহিত্যের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইহলোকের মালমসলা নিয়েই আর একটি কল্পলোকের সৃষ্টি করা—যে লোক এই মাটির পৃথিবীর চাইতে ঢের বেশী সুন্দর ঢের বেশী সত্য এবং ঢের বেশী অক্ষয়।

সাহিত্য ব্যক্তির মনকে যে ঐশ্বর্য্য দান করেছে, তাতে জাতীয়-মনের সৌন্দর্য্য এবং সম্পদ বেড়েছে। এরপর গোটা জাতিটার উপরেও সাহিত্যের প্রভাব যথেষ্ট আছে। যে গণতন্ত্রীয় শাসন-প্রণালী, আজকের দিনে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেই ইউ-রোপের এমন দিন ছিল, যখন তার কাছে ওটি স্বপ্নের চেয়েও অলীক ছিল। দরিদ্রজনসাধারণের কাছে সে দেশের ধনী জমিদার 'ধর্ম্মাবতার প্রবল প্রতাপান্বিত' ছিল। মানুষের সঙ্গে মানুষের এই অস্বাভাবিক ব্যবধান, ইউরোপের সাহিত্যিকেরাই দূর করেছেন। তাঁরাই সাম্য-বাদের উপর গণতন্ত্রের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। তারপর মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বঙ্কিমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতির সৃষ্ট সাহিত্য বিগত ৪০ বছরের মধ্যে আমাদের জাতীয়মনে যে পরিবর্ত্তন উপস্থিত করেছে, তা চোখ মেলে চাইলেই দেখতে পাওয়া যায়।

(৪)

সাহিত্যে পাওয়া যায় ভাবীজীবনের পূর্ব্বাভাষ। এমন একদল লোক সকলদেশেই আছেন, সাহিত্যের ঐ নূতন আইডিয়ালটাকে যাঁরা শনির অবতার মনে করেন। এঁদের সাধ বেশ আয়েস করে চিরপুরাতনের গুহায় ঘুম দেন। নতুনকে বরণ করে নেবার শ্রম-স্বীকার এঁদের ধাতে নেই। কিন্তু মানুষ আপনার খুসিতে যদি চলতে না শেখে, কালের কষাঘাতে একদিন তাকে নতুনের পথে এসে দাঁড়াতেই হয়। কালের ধর্ম্মে যেটা একদিন আস্‌বেই সাহিত্য তার পূর্ব্বপরিচয় যদি করে দেয় তাতে দোষ কি? বরং সুবিধেই আছে। নতুনের সঙ্গে যেদিন সাক্ষাৎ হবে, সেদিন তাকে আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে করে ভয় পাব না, তার সঙ্গে যে আমাদের আগে থাক্‌তেই পরিচয় হয়ে গেছে এইটে দেখে খুসি হয়ে তাকে বরণ করতে পারব। সেই অনাগত বন্ধুর দ্বাররোধ করে নিজেদের কল্যাণকে বিমুখ করব না। আর কালের গতি যে বড়ই কুটিল, প্রতিকাজ-কর্ম্মে আমাদের এ অভিযোগ খাড়া করতে হবে না।

সমাজের প্রায় সকল-ক্ষেত্রেই ত দেখছি, নূতন-পুরাতনের একটা দ্বন্দ্ব চল্‌ছে। পিতা-পুত্রের শ্বাশুড়ী-বধূর আইডিয়ার গরমিল থাকাতে মনের অমিল ঘট্‌ছে। নবীন প্রাচীনের শাসন মান্‌ছে না। প্রাচীন নবীন প্রাণের আব্‌দার সইছে না। এতে করে সমাজের ভিতর অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। আর দোষারোপ হচ্ছে কাল-বেচারীর উপর, যেহেতু তার একটা গতি আছে। চিরপুরাতনের মধ্যে সে আবদ্ধ থাক্‌তে পারে না। নূতন নূতন পথ বেয়ে তাকে চল্‌তে হয়। জাতীয়মনে নূতন-পুরাতনের বিরোধটা বড় বেশী সাঙ্ঘাতিক হয়ে উঠ্‌তে পারে না, যদি সাহিত্য পূর্ব্ব হতে এসে পুরাতনকে নব-মন্ত্রে দীক্ষিত করে।

অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যের বিরুদ্ধে এই একটি অভিযোগ উপস্থিত করা হয়, যে সাহিত্য জাতীয়জীবনে দুর্নীতির প্রশ্রয় দেয়। সকল স্থলেই অভিযোগটি যে একেবারে মিথ্যা, সে কথা অবশ্য বলিনে। তবে অধিকাংশ স্থলেই এ অভিযোগের মূলে কোন সত্য নিহিত থাকে না। যাঁদের এ অভিযোগ তাঁদের প্রকৃতি—যাঁরা চরিত্রের কলঙ্ক রট্‌বে এই আশঙ্কায় চিকিৎসকের কাছে আপনার ব্যাধি গোপন রাখেন, যে পর্য্যন্ত না ভীষণ আকারে তা দেখা দেয়,—ঠিক তাঁদেরই মত।

যাঁরা প্রতিভাবান সাহিত্যিক তাঁদের একটা গুণ, তাঁদের প্রাণের সরলতা। তাঁদের অন্তর-বাহির একেবারে স্বচ্ছ। মানুষ ভিতরের কলুষ গোপন রেখে, বাইরে সাধু সাজবে এ কপটতা তাঁদের চক্ষুঃশূল। তাই জাতিরও অন্তরের যে গলদ, সাহিত্যিক সেটাকে সমাজের সাম্নে ধরে তার আলোচনা করেন। কিন্তু অনেকেরই সাধ, আত্মগোপন করে, বাহিরে সাধু সাজেন।

তারপর সমাজ-কর্ত্তাদের সঙ্গে সাহিত্যিকদের একটা বিরোধ অনেক সময় দেখা দেয়। উভয়-পক্ষের উদ্দেশ্য এক হলেও, পথটা অনেক সময় বিভিন্ন। অজ্ঞতার অন্ধকারে মানুষের স্বভাবটাকে মানুষের কাছে গোপন রাখ্‌বে, এ সাহিত্যিকদের অভিপ্রায় নয়। তাঁদের কথা, আইডিয়ালর-বলে মানুষের অন্তরটাকে যখন ফুলিয়ে ফাঁপিয় তোলা যায়, তখনই মানুষ আপনার স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা ছাড়িয়ে অনেক ঊর্দ্ধে উঠ্‌তে সক্ষম। সাহিত্যিক তাই, অসাধ্য-সাধনের ব্রতগ্রহণে মানুষের মনকে আহ্বান করেন। সাহিত্যিকদের কাছ থকে এর একটা উদাহরণ নেওয়া যাক।

Goethe তাঁর Affinities বইতে মানুষের প্রকৃতিকে যেন রাসায়নিক প্রণালীতে বিশ্লিষ্ট করে, তার ভিতরের হীনতা দুর্ব্বলতা

মানব-সমাজের সুমুখে ধরলেন। কিন্তু Goethe কি বাস্তবিকই সমাজে দুর্নীতি প্রচার করলেন? তিনি দেখালেন, মানুষ যখন আপনার প্রকৃতির দাসত্ব করে, তখন তার অধোগতি কতদূর সম্ভব, আর ইচ্ছাশক্তির বলে মানুষ আপনাকে ছাড়িয়ে কত ঊর্দ্ধে উঠতে পারে। Edward ছিল স্বীয় প্রকৃতির দাস, কিন্তু Edward ত Goethe-র আদর্শ-চরিত্র নয়। মানুষ আপনার প্রকৃতির দাসত্ব করবে, এ শিক্ষা Goethe কখনও দিতে পারেন না। কেননা, Goethe-র কথা,—Man alone

Can achieve the impossible.

Goethe-র শিক্ষা মানুষ তার ইচ্ছাশক্তির বলে, অসাধ্যসাধন করবে। ঐ অসাধ্যসাধনেই মানুষের মনুষ্যত্ব। Goethe-র যা শিক্ষা, সেই একই শিক্ষা বিভিন্ন দেশের সাহিত্যিকেরা দিয়েছেন। তাঁরাই মানুষকে আকাশ কুসুমের স্বপ্ন দেখিয়েছেন, আর সে আকাশ-কুসুম লাভ করবার উৎসাহ-উদ্দীপনা মানুষের অন্তরে জাগিয়েছেন। মানুষ ব্যক্তি বা জাতি হিসেবে যে উন্নত হয়েছে, সে তার আস্তা-কুঁড়ের দিকে নজর রেখে নয়, আকাশ-কুসুমে লক্ষ্য রেখে। আকাশের কুসুম হয়ত আকাশেই রয়ে গেছে, কিন্তু তার লাভের সাধনা থেকে মানুষ শক্তি পেয়েছে,—আপনার পশুত্বের সীমা অতিক্রম করে, দেবত্বের উচ্চতর লোকে অগ্রসর হতে।

It is the striving after, not the attaining of ideals, that is the motive-power behind human endeavour. Ideals recede farther and farther as we advance, but we rise towards the stars as we seek them—জর্ম্মাণজাতি

যখন আকাশ-কুসুমে বিশ্বাস হারিয়েছিল, Schiller তার কানে এই মন্ত্র দিয়েছিলেন।

(৫)

এতক্ষণ যে কথা বললুম, সেটা বিশেষ করে সাহিত্যের সৃষ্টির দিকটা নিয়ে, তার আর একটা দিক আছে, সেটি হচ্ছে ধ্বংসের দিক। Criticism of life, বা জীবনের সমালোচনা,—আর্টের এই লক্ষণটি বেশী স্পষ্ট হয়ে সাহিত্যের এই দিকটায় ফুটে ওঠে। জাতীয়-জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের এই ধ্বংসের দিকটার কি সম্বন্ধ তার আলোচনা করা যাক।

মানুষের মনের সম্পদ রক্ষা এবং বৃদ্ধি করবার ভার সাহিত্যের হাতে। তবু মানব মনকে সবল ও সুশ্রী করে গড়ে তুলতে হলে, মানুষের ভিতরের জীর্ণতাতে আঘাত করে, পুরাতনকে ধ্বংস করতে হয়। ওটি ভগবানেরই বিধান, কেননা তিনি তাঁর বিশ্বপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য রক্ষা করবার জন্য কেবল যে সৃষ্টিকর্ত্তা হয়ে নতুনের সৃষ্টি করছেন তা ত নয়, পুরাতনকে ধ্বংস করবার জন্য সংহার মূর্ত্তিও ধারণ করছেন। সাহিত্যেও ঐ দেবতার আবির্ভাবের বিশেষ প্রয়োজন, কেননা পুরাতনকে ধ্বংস না করলে, সেখানে নতুনের সৃষ্টি জীর্ণ-বাড়ির নতুন রঙ্-ফেরানো মাত্র হবে।

বাহির থেকেই এ-সাহিত্য তার শক্তি-অর্জ্জন করে। জাতির আপনার গণ্ডির ভিতর, বদ্ধ এবং দূষিত আবহাওয়াতে এ সাহিত্য পুষ্ট এবং পরিবর্দ্ধিত নয়। বিশ্বের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার উপাদানেই এ সাহিত্যের সৃষ্টি। এ সাহিত্যের উদ্দেশ্য দেশবাসীর মনোরঞ্জন করা

নয়, আঘাত করাই এ সাহিত্যের কাজ,—জাতির অন্তরে যেখানে হীনতা, কপটতা এবং সঙ্কীর্ণতা, সেইখানে আঘাত করা। এ সাহিত্য যাঁদের সৃষ্টি, তাঁদের বিরুদ্ধে সকল দেশই এই অভিযোগ খাড়া করা হয়, যে তাঁরা স্বদেশ-দ্রোহী, স্বজাতি-বিদ্বেষী। Goethe যখন তাঁর স্বজাতির মনে আঘাত করেছিলেন, তাঁর বিরুদ্ধেও ঐ অভিযোগ আনা হয়েছিল। Goethe তার যে জবাবটি দিয়েছিলেন, আমার মনে হয়, এঁদের সকলের পক্ষ হতে ঐ একই জবাব দেওয়া যেতে পারে,—What is meant by love of one's country? If the poet has employed life in battling with pernicious prejudices, in setting aside narrow veiws, in purifying the tastes of his countrymen, what better could he have done?

দেশের প্রতি অন্ধভক্তি যাঁদের আছে, তাঁরাই দেশের যথার্থ হিতসাধক নন। জাতির মঙ্গল-সাধন তাঁদের দ্বারা হয় না, যাঁরা জাতির অন্তরের যত কলুষ চাপা দিয়ে রেখে, শতমুখে তার প্রশংসা করেন। দেশবাসীর অন্তরের সঙ্কীর্ণতা দূর করবার, এবং জাতীয় মনের হীনতার উপর আঘাত করবার শক্তি যাঁদের আছে, তাঁরাই দেশের বা জাতির পরমমিত্র। আমার ত ধারণা, জাতীয়জীবনের Sanitation-বিভাগের কাজ-কর্ম্ম তখনই বেশ সুচারু-রূপে সম্পন্ন হতে পারে, যখন তার portfolio সাহিত্যের প্রলয়-দেবতা এসে হাতে নেন্। এ সিদ্ধান্ত আমার কোন যুক্তির বলে, তা নির্দ্দেশ করছি।

অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ-সাধনের সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক জাতির ধর্ম্ম এবং সামাজিক জীবনের অনেক বিধি-বিধান এবং প্রথা-পদ্ধতির প্রাণ-বিনাশ হয়েছে, কিন্তু তাদের জায়গাটি জুড়ে

তাদের শব পড়েই রয়েছে। এর কারণ কি, তার উত্তর দেবে, যাঁরা মৃত-দেহের সৎকার কখনও করেছেন, তাঁদের আপনার অভিজ্ঞতা। মানুষের মৃত্যুর পর, তার শবটার উপর তার আত্মীয়-স্বজনের মায়া বড় কম নয়। কিন্তু সে মায়াকে কাটিয়েও সে দেহের সৎকার করাতেই গৃহের মঙ্গল।

যে সব সাহিত্যিক, জাতির মঙ্গলের জন্য জাতির অন্তরে আঘাত করেন, তাঁদের তুলনা,—যাঁরা মায়ের প্রাণে তীব্র-বেদনা দিয়ে মায়ের কোল থেকে মৃতশিশুটিকে কেড়ে নিয়ে যান শ্মশানে তার সৎকার করতে,—তাঁদেরই সঙ্গে। যখন দূষিত বাষ্পে জাতীয়মনের আব্‌হাওয়া বিষিয়ে ওঠে, তখন ঐ শ্রেণীর সাহিত্যিকেরাই জাতির মানস-পুত্র এবং মানস-কন্যাদের মৃতদেহের সৎকার করে জাতীয়জীবনের মঙ্গল সাধন করতে সমর্থ।

(৬)

সাহিত্যে আর এক প্রকারের শ্রেণীবিভাগ আছে। মানব-প্রকৃতির যেমন দুটো দিক আছে, ভাবের এবং বুদ্ধির দিক। মানব-মনের সৃষ্টি, সাহিত্যেরও তেমনি দুটো দিক, একটি হচ্ছে তার ভাবের দিক, আর একটি হচ্ছে বুদ্ধির দিক।

ভাবের প্রাচুর্য্য যে সাহিত্যের ঐশ্বর্য্য—তার সম্বন্ধে দু চারটি কথা বলা আবশ্যক। একদল সমালোচক আছেন, ভাবপ্রধান সাহিত্যকে তাঁরা বাহুল্য-সৃষ্টি মনে করেন। তাঁদের মত, এ সাহিত্যের দ্বারা জাতীয়জীবনের কোন মঙ্গল সাধন হতে পারে না। এঁদের এই মতের সত্যাসত্য বিচার করে দেখা দরকার মনে করি।

ভগবানের এই বিশ্বসৃষ্টির সম্বন্ধে একটি মত প্রচলিত আছে, সেটিকে anthropocentric dogma বলে; যাঁরা ঐ ডগ্‌মাটি মেনে চলেন, তাঁদের ধারণা একমাত্র মানবজাতির জন্য ভগবান এই বিশ্ব-প্রকৃতি রচনা করেছেন। এই হেতু তাঁদের পক্ষে এটা খুব স্বাভাবিক হবে, যদি বিশ্বের যে যে বস্তু মানবজাতির কোন কাজে না আসে, সেগুলোকে তাঁরা ভগবানের বাহুল্য-সৃষ্টি মনে করেন। ভগবানের বিরুদ্ধে ঐ বাহুল্য-সৃষ্টির অভিযোগ মানুষের অন্তরে আছে কিনা, তা জানিনে, প্রকাশ্যভাবে সে অভিযোগটি উপস্থিত করতে কেউ কোন দিন বোধ হয় সাহস করেন নি। কিন্তু কবি যে কাব্য লিখলেন, তা যদি কোন সমালোচকের অভিরুচির অনুরূপ সৃষ্টি না হয়, তখনই সে কবির বিরুদ্ধে সমালোচক অভিযোগ উপস্থিত করেন।

ধরুন, কোন কবির অন্তরে ভাবের খুব প্রাচুর্য্য। তিনি অন্তরের ভাবে বিভোর হয়ে প্রাণের কথা শোনালেন, যাঁদের প্রাণ আছে তাঁদের। আর সমালোচক,—যাঁর বুদ্ধির দিকটায় জোয়ার এসে থাকবে, কিন্তু ভাবের দিকটায় হয়ত ভাটা পড়েছে, কবির সঙ্গে প্রকৃতিগত অনৈক্য বা রুচির বৈষম্য ঘটায় কবির সৃষ্টিকে তিনি নিরর্থক মনে করলেন। কিন্তু একমাত্র মানবজাতির জন্য যেমন ভগবানের সৃষ্টি নয়, কবির সৃষ্টিও তেমনি কোন ব্যক্তিবিশেষের কিম্বা কোন উদ্দেশ্যবিশেষের জন্য নয়। সমালোচক, কবির যে সৃষ্টিকে নিরর্থক মনে করলেন, জাতির কাছে তার যদি কিছুমাত্র সার্থকতা থাকে, তাহলে তাকে বাহুল্য-সৃষ্টিমাত্র মনে করা সঙ্গত নয়।

জাতির দিক থেকে এইবার বিচার করা যাক। জাতি অর্থে ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তির সমষ্টিকে বোঝায়। ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির

বল্লুম, কেননা, রুচি ও প্রকৃতির বৈচিত্র্য মানুষের ভিতর চিরদিনই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। সমালোচকের যে প্রকৃতি ও ধর্ম্ম, তার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির এবং ভিন্নধর্ম্মী ব্যক্তি জাতির মধ্যে অনেকেই থাকবেন, এটা বড় আশ্চর্য্য কথা নয়। ভাবের দিকটাই যাঁদের অন্তরে প্রবল, ভাবের দিক থেকে যে সাহিত্যে সৃষ্টি, সেই সাহিত্যই তাঁদের পরম সম্পদ। কবির কাছে প্রাণের কথা না শুন্‌লে এঁদের অন্তরাত্মা গুমরে মরে। ভারের প্রাবল্যহেতু কবির সৃষ্টিকে বাহুল্য-সৃষ্টি জ্ঞান করে দেশ থেকে কোনজাতি যদি তাকে নির্ব্বাসিত করে, তাহলে সে জাতির গড়ন কখন সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হতে পারে না। দেহের শ্রী তার প্রতি অঙ্গের সৌষ্ঠবে, একটি অঙ্গ যদি খর্ব্বাকৃতি হয়, তাতে সকল দেহের শ্রীহানি হয়। জাতীয়মনের একটা দিক যদি শুকিয়ে যায় আর একটা দিক যদি ফুলে ওঠে, তাহলে সে মনের চেহারা সুসঙ্গত এবং সুন্দর হতে পারে না। জাতির সভ্যতা তখনই পূর্ণাবয়ব হয়ে উঠ্‌বে, যখন তার সাহিত্যের সকল দিকের সমান উৎকর্ষ সাধিত হবে। সাহিত্যের সঙ্গে জাতীয়জীবনের সম্বন্ধ কোন একটা দিকের সম্বন্ধ ত নয়; জাতির রাষ্ট্র, ধর্ম্ম এবং সামাজিক জীবন, তার আভ্যন্তরীণ যে শক্তির বলে সুস্থ সুশ্রী এবং সবল হয়ে ওঠে, সাহিত্যই সেই শক্তির আধার।

শ্রীবীরেশ্বর মজুমদার।

হৈরা।

(মাণিকগঞ্জের মৌখিক ভাষায় লিখিত)

মা-বাপমরা ছোট ছাওয়ালটারে যেদিন গায়ের একজন গিরস্ত লোক মাসির বাড়ীতে আইনা দিয়া গেল, সেইদিন থিকা তার মাসি সেই হাড্ডিসার ছোট ছাওয়ালটার ক্যাবল যে আশ্রয়স্বরূপ হৈল তা না,—বেওয়া বিধবা মাসির অপায়া সংসারটাও য্যান একটা কিছু হাতের সাম্‌নে পায়্যা আস্তে ধীরে গুছায়্যা উঠব্যার্ লাইগ্‌ল। বাপ-মায় কি বৈলা যে ছাওয়ালটারে ডাইক্‌ত, আইনা-দেওয়া লোকটী তা কিছুই কইব্যার পারে নাই। দিন চাইরেক কোকন বৈলা ডাইক্‌ব্যার পরে মাসির মনে বইন্‌পুতের একটা নাম মন-উক্তেই জোয়ায়্যা উঠ্‌ল; সে বইন্‌পুতের নাম রাইখ্‌ল গয়ানাথ। ইস্তককাল গয়ার পিণ্ডির কথা মনে হৈতে মাসি তিনকুল বিচ্‌রায়্যা কাক প্রাণীডাও পাইত না, বৈতরণী পার হওয়নের কথা মনে হৈলে তার নিলক্ষের চক্ষু ভয়ে বুইজ্যা আইস্‌ত।

একেই ত বইন্‌পুৎ, তাতে আবার স্বগোত্তর কাজেই গয়ানাথের হাত দুইখানিরে রাইমণি ক্যাবল হাতই মনে কৈরত না, পিণ্ডির আধার বৈলা সে হাতে সোয়াগ্ কৈরা সোনার বয়লা পরায়্যা দিল। মানুষে কইতেই কয় যে কোনতারই বাইড্ ভাল না। ইক্ষেত্রে সে কথা হাতে হাতেই ফইল্‌ল। মাসির দিন রাইত আঢালা সোয়াগে গয়ানাথ খুব একজন আল্লাইদা ছাওয়াল হইয়্যা উঠ্‌ল। পাড়ার

ছাওয়ালগোরে যার হাতে যা দেখে মাসির কাছে কান্দন জুইড়্যা দিয়্যা তাইই আদায় কইর‍্যা নেয়। এই ভাবে পনর বচ্ছর পার হওয়নের পর সে যখন বেশ ডাঙর হইয়্যা উঠ্‌ল তখনো তার পড়া-শুনার নামগন্ধও তার নিজের কি তার মাসির কেউরই মনে উদয় হৈল না। ছাওয়াল-পাওয়ালের পড়ন-শুনন কোন কালেই আপন গর্‌জে হয় না মুরুব্বির উর্য্যোগেই হইয়্যা থাকে। গয়ানাথের এক-মাত্র মুরুব্বি মাসি। তার ধারণা যে লেখন-পড়ন শিখন লাইগ্‌ব এক যারা বিধি-বিধান দেয় আর যারা চাকুরী কইর‍্যা খায়, মাত্র তাই গোরে। রাইমণির জোত জমার যা আয় তাতে তার সংসারে খরচ-পত্র ভালয়ালে কুলায়্যাও কিছু কিছু উবুর্‌ত। এই ভাবে ফি বচ্ছরের অল্পবিস্তর বাড়্‌তি রাইমণির হাতে জইম্‌তে জইম্‌তে তার একটু তেজারতি কার্‌বারও জাঁইক্যা উঠ্‌ছিল। সুতরাং বইন্‌পুতের লেখন পড়ন শিখানের কথা মাসির যে মনেই হইত না ইয়াতে আচম্বিৎ হওয়নের কারণ কিছুই নাই। কিন্তু তাই বৈলা ঘর-গিরস্তালির কামকাজ ও আওয়ৎ বিয়ৎ শিখান মাসির নজর একটুও এড়ায় নাই। নিজের স্বার্থ বুইঝ্যা নিতে রাইমণি অপটু আছিল না কিন্তু ক্ষ্যাণে ক্ষ্যাণে দেখা যায় বাশের থিকা কঞ্চি দর, গয়ানাথের সম্বন্ধে ই-কথাটা একিকালে কাপে কাপে খাইট্‌ত। মাসির শিক্ষাগুণে বইন্‌পুৎ আখরে অজ্ঞান থাইক্যাও আখেরের চুর‍্যান্ত জ্ঞানী হইয়্যা উঠ্‌ল—ঘরের খাইয়্যা বনের মইষ সে কোন কালেই খ্যাদায় নাই।

রাইমনির সংসারে এক মাত্র চাকর হৈরা। গয়ানাথ যখন ই-বাড়ীতে আইসে নাই তার আগের থিকা সে রাইমণির চাকর। এখন তার বয়েস হই্চে বৈলা রাইমণি তারে বেশী কিছু ফর ফরমাইস্

পার্য্যমানে দিত না কিন্তু গয়ানাথের বুদ্ধি বাড়নের লগে যেমুন তার কর্ত্তাগিরি বাইরা উঠ্‌ব্যার লাইগ্‌ল, হৈরার খাটুন্নীও সেই সাথে সাথে কমনের বদলে দিনে দিনে বাইরাই চইল্‌ল। বইন্‌পুতের আইসনের আগে নিসন্তান রাইমণির একটু স্নেহ এই হৈরা দখল কইর্‌তে র‍্যাৎ করে নাই, তাই তারে অতিরিক্ত মেহানৎ কইর্‌তে দেইখ্‌লেই রাইমণির কাছে অসহ্য ঠেই্‌কত। কিন্তু গয়ানাথ হৈরার বিনাকামে বইসা থাকন একিব্যারেই দেইখার পাইর্‌ত না। এই অনুজরের চাকরটীরে নিয়া ই-দাইন্‌কে মাসি বইন্‌পুতের মধ্যে এক আধটু ঝগড়া ঝাটির সুরু হৈব্যার লাইগ্‌ল। হৈরা মানুষটা আছিল বুদ্ধিতে কিছু খাটো কিন্তু তার বুকের পাটাটা আছিল খুব বড় আর কৈল্‌জাটা খুব নরম। ধারে কাছে গিরস্তলোকের ফ্যারে অফ্যারে তার শীত গীরিষ্মি জ্ঞান থাইক্‌ত না।

যে কালের কথা কওয়ন হইতাছে সে আছিল ফাগুন মাস। গয়ানাথের হুকুম মতে হৈরা ভোর বিয়ানে উইঠা চৈতালি ফসল বুইব্যা আইন্‌ব্যার জন্যে বর্‌গাদারের বাড়ী যাইব্যার লাইগ্‌ছিল—এমুন সুমে পথে মরা কান্দন শুইনা তার পাচ পরাণ ছ্যাৎ কইর‍্যা উঠ্‌ল। বর্‌গাদারের বাড়ী আর তার যাওয়ন হৈল না, সে তাড়াতাড়ি গোশাই বাড়ীর দিগে ছুইটা গেল।

হৈরা যখন গোশাই বাড়ীর আঙ্গিনায় পাও দিছে তখন সে বাড়ীর মাঠাগেন আঙ্গিনায় বাইর-করা মরা ছাওয়ালের মুখে উপুর হইয়া পইর‍্যা মাথা কুইটা কাইন্দব্যার লাগ্‌ছিল। রাধিকা গোশাইর মাঝারো ছাওয়ালটীর উপুরে পোর্শু রাইতের থিকা ওলা দ্যাব্‌তার নজর হওনের কথা সে আগেই শুন্‌ছিল কিন্তু কোন ছুতায়ই গয়ানাথের কামকাজ

এরায়্যা একবার আইসা খোঁজটাও নিবার পারে নাই, তার দুই চইখ্‌ বাইয়্যা দরদরায়্যা জল পইর‍্যার লাইগ্‌ল।

দুপুরের ঠিক যখন ঠাটাপরা রৈদ, সেই সুমে হৈরা মরা পুড়ান সারা কইর‍্যা পরণের কাপড় গায়ে শুকায়্যা ফিরা আইচে। তার পরাণ তখন খিদায় জর্‌ জর্‌, শরীর তেষ্টায় থর্‌ থর্‌ কইরব্যার লাইগ্‌ছিল বর্‌গাদারের বাড়ীর থিকা ফিরণের দেরি দেইখা গয়ানাথ যে তার সব কাণ্ড কারখানা মন্নে মনেই ঠাওয়র কইর‍্যা নিছে, বিন্‌হুকুমে পরের কামে যাওয়নে সে যে চাকরের উপুরে রাইগা আগুন হইয়্যা বইসা রইছে, হৈরার তা বুইঝ্‌ব্যার বাকী আছিল না। সে তাই বাড়ীর সামনে দিয়া সরাসর না ঢুইকা কাঞ্জি কোনা ঘুইর‍্যা একিকালে মাঠাগেনের হবিষ্যিঘরের আঙ্গিনায় যাইয়্যা খাওয়নের লাইগা হাজির হৈল। কিন্তু হৈরার নছিপের ফ্যারে গয়ানাথ তখন বাড়ীর মধ্যেই আছিল। হৈরার আওয়াজ শুননমাত্রই সে পায়ের খরম খুইলা এমনভাবে হৈরার উপুরে রুইখা খারাইল যে সে ফ্যাল ফ্যালাইয়া রাইমণির দিগে তাকাইতে তাকাইতে ভয়ের চোটে দুই এক পাও কইর‍্যা না পাইছায়্যা থাক্‌ব্যার পাইর্‌লো না। গয়ানাথের ব্যবহার রাইমণির কাছে আইজ ভারি অসহ্য ঠেইক্‌ল। সে রাগের মাথায়, তার বাড়ীর থিকা তারি চাকরেরে খেদায়্যা দেওয়ানের কোন একতারই যে গয়ানাথের নাই, এই ভাবের একটা কথা খুব রুইঠা সুরে কইয়্যা ফেলাই-ল।

এত বড় একটা খোটা সওয়নের মতন ম্যাজাজ গয়ানাথের কুষ্টিতেই লেখা নাই। সে যে পরের খায়্যা মানুষ, এই কথা সে সাক্ষাতে অসাক্ষাতে পারাপোর্শিগোরে মুখে যখন তখনই শুইন্‌ত,

আর তার কোনই শোধ না তুলব্যার পাইর‍্যা মনে মনে ইলাগাৎ আশ্রয়দাতারেই দোষী ঠাওরায়্যা আইস্‌ব্যার লাইগ্‌ছিল ; তার উপুরে আবার চাকরের মোকাবিলায় এই দারুণ অপমানের খোটা আইজ্‌ তারে রাগের মাথায় দুপুইরা চাড়াল কইর‍্যা তুইল্‌ল। সে হাতের খরম ফেলায়্যা চক্ষের পলকেই একটা পাইট্‌খেল কুড়ায়্যা আইন্‌ল, হৈরা যখন চিক্কখইর দিয়া উঠ্‌ছে তখন গয়ানাথের জোরে ফেইকা দেওয়া পাইট্‌খেলের গুতায় রাইমণির মাথা খণ্ড বিখণ্ড হইয়্যা গেছে, তার নিসস্বিৎ শরীর রক্তে মাখাচোখা হৈয়া মাটিতে লুটাইবার লাইগ্‌ছে।

বেলা তলানের আগেই যার যার মতো কিছু কিঞ্চিৎ ট্যাকে গুইজা গায়ের যত মুরুব্বি-মাতব্বর এই ব্যাপারটারে পানে চুনে মিশানের মতন নিভাজে হজম করণের লাইগা এক জুঠ্‌ হৈল। সদ্য খুনের দিন বৈলা স্মৃতিচুরামণি মশয় সে দিন আর ঐ দলে যোগ দিলেন না কিন্তু পরের দিন তিনির মোকাবিলা গয়ানাথ যেমুন রাইমণির পাওনা টাকার খতখান ফাইরা ফ্যালাই্‌ল, অম্‌নি তিনর মনে বাওয়নের জাইৎ রাখনের লাইগা ফট্‌ কৈরা ধর্ম্মভাব উৎলায়্যা উঠ্‌ল। তিনি পাচ জনের সাথে একমত ত হৈলেন-ই—তার উপুরে বাওয়নের ছাওয়াল জেলে গেলে তার যে জাইৎ যায়, আর যে গায়ের বাওনের জাইৎ যায় সে গায়ের চেংড়া বুইড়া বেবাকেরেই যে পাপপঙ্কে ঘিরা ধরে, ও তার ফলে যে হাজার বচ্ছর কণ্ডুক-নরক ভুগণ লাগে, এই সকল শাস্তর প্রমাণের কথা গায়ের দশ জনেরে নিজে থিকা ডাইকা আইনা শুনাব্যার লইগ্‌লেন।

অনেক দূরে থাইকাও যেমুন মরা জীবজন্তু শকুণের নজর এর‍্যায় না, লাভের তদন্তও সেই রকম গায়ের চৌকিদারে চাপা দিলেও

থানার দারগাগোরে কাণে ঠিক মত পৌছে। গায়ের লোকের সাব্যস্ত থাকন সত্বেও রাইমণির মরণের চাইর দিনের দিন দারগা আইসা গায় অধিষ্ঠান হৈল। তখন মুখে কেউ কিছু না কৈলেও মুরুব্বিগোরে বেবাকেরি পাচ পরাণ তলে তলে থগড় বগড় কইর‍্যা উঠ্‌ল। কিন্তু দারগাসায়াব যখন সরাসর আসামীর বাড়ীতে না ঢুইকা তিনু সরকারের বাড়ীতে আড্ডা নিলেন, তখন সকলের মনেই অল্পবিস্তর সায়স জইম্‌ল। গায়ের মধ্যে তিনু সরকার দারগা পুলিশের ওয়াকিব জানা লোক। আরো কয়েকবার এই গায় দারগা তদন্তে আইছিল তখন তিনুই মধ্যে পইরা সব গোলমাল অল্পে সল্পে মিটায়্যা দিছে। আসামীরে ধৈরা আননের জন্যে কনেষ্টবল পাঠানের আগেই তিনু নিজেই যাইয়্যা গয়ানাথেরে সাথে কইরা, আইনা দারগার সুমুখে হাজির কইরা দিল। দণ্ডেকের মধ্যেই বাওয়নের জাইৎ বাচানের লাইগা দারগাবাবুও গায়ের মুরুব্বিগোরে সাথে এক মত হৈলেন, ও সেলামীর টাকা তিনশ কনেষ্টবলেরে গইনা নিবার কইয়া, গুরগুরির নলটা মুখে গুইজা দিলেন। এম্‌নি কইরা দারগা বাবুর চিৎ যখন ঠাণ্ডা হইয়্যা আইল তখন তিনি গায়ের পাচ জনের দিগে ফিরা বইসা, পারাপর্শিরা ইয়া নিয়া যাতে আর কোন সুর গোল না করে, তারির পরামিশ দিবার লাইগ্‌লেন ; এমুন সুমে পূব পাড়ার মুরুব্বি রূপলাল রাইমণির চাকর হৈরারে সাব্যস্ত কইরা দিয়া যাওয়নের কথা জানায়্যা হুজুরের সাম্‌নে হাত জোর কইর‍্যা খারাইল।

খুনের মোকাবিলা সাক্ষী মাত্র হৈরা। তার মুখ বুজানের জন্যে বেবাকের আগে গায়ের মুরুব্বিরা তারি একলার হাতেই পচিশ টাকা দিব্যার গেছিল, কিন্তু সে দুই হাতে মুখ ঢাইকা সেই যে উইঠা গেছে

তারপরে ইলাগাং কেউই আর তার লাগুর পায় নাই। ছোট কালের থিকাই সে আছিল রাইমণির চাকর। সগণ সরীক কেউ ত তার নাইই, বৈরাগী ফকিরেরও নিজের একখান ডেরা কুইরা থাকে তার তাও নাই। রাইমণির মরণের পরদিন থিকা গায়ের বাওয়ন ভদ্র বেবাকেংেই যখন সে গয়ানাথের পক্ষ নিতে দেইখ্‌ল সেই দিন থিকা সে আর কেউর বাড়ীতেই যায় নাই। আইজ কয়দিন ধইরা সে তার ছোট-কাইলা মিতা হরি মালির কাছে আশ্রয় নিছে। মাঠাগেনের শোকে তার কৈলজাটা যে ফাট্ ফাট্ করে তা সে তার মিতারেও বুঝায়্যা উঠ্‌ব্যার পারে নাই।

হৈরা আইসা দারগার কাছে খারাইতেই ইকয়দিনকার চাপা কান্দন তার মুখ চইখ্ ছাপায়্যা বাইরয়্যা পৈল। খানিক বাদে কান্দন থাইমা আইলে, সে যেমুন তার মাঠাগেনের খুনের নালিশ হুজুরের কাছে মনের খেদ মিটায়্যা জানাইব ভাইবা একটু থির হইয়্যা রইল, ঠিক সেই সুমে দারগা তারে ঠাণ্ডা হৈতে দেইখা সে যাতে আর এই খুনের বিষয় নিয়া কোন রকম সুরগোল না করে, এই কথা ফিরা ফিরা দুই তিন বার তারে বুঝায়্যা কইলেন আর তিনির কথামতন না চইল্‌লে তার নিজেরও ফাস্যাদে পড়ন লাইগ্‌ব ইয়াই বৈলা একটু শাসায়াও রাইখ্‌লেন। দারগার ই-সকল কথায় হৈরা হাঁ হুঁ কিছুই না কইয়্যা ক্যাবল থম্ ধইরা বইসা রইল। ইয়ারি মধ্যে দারগা সায়াব তিনু সরকারেরে কি য্যান্ ইসারা কইর্‌লেন আর সে উইঠা গয়ানাথের হাতে থিকা গোণা পনরটী টাকা নিয়া হৈরার মুঠের মধ্যে রাখ্‌তেই সে হেচ্‌লা টান দিয়া হাত ছারায়্যা আইন্‌ল, ফলে তার হাতের উছটে তিনুর হাতের বেবাক টাকা ঘরময় ছরায়্যা পইল, এবং

তারি একটা টাকা দারগার ডেনায় ছিটা পরলে, তিনি রাইগা অগ্নি-শর্ম্মা হৈলেন। তিনির মুখের ভিরকুটী ও চইখের ভাব দেইখা আর কেউ কিছু ঠাওয়র না পাইলেও তিনুর বুঝতে বাকী রইল না যে হৈরার শ্রীমন্দিরে যাওয়ন ঠেকানের লোক আর ই পির্‌থিমিতে কেউই নাই।

সাত দিন পরে মহুকুমার মাজিস্টরের এজ্‌লাসে হৈরার বিরুদ্ধে,—থানায় খুনের মিথ্যা এজাহার দেওয়ন আর দারগা রাসবিহারী দাসের উপ্‌রে খামাখা রুইখা যাওন, এই দুই অপরাধের দুই নম্বর মামলার বিচার এক সাথেই সারা পাইল। স্বয়ং দারগার জোবানবন্দী হওয়নের পরেই তিনু সরকার সাক্ষীর কাঠগরায় খারাইল। তার জোবানবন্দীর সুরুতে রাইমণি সন্ন্যাস রোগে মইরা গেছে তক শুন্‌তেই হৈরার মুখে চইখে কেমুন য্যান্ একটা চমক্ লাইগ্‌তে দেখা গেল। বোধ করি, সাক্ষীর কথায় আসামীরে চইম্‌কা উঠ্‌তে দেইখাই সে যে পূরা অপরাধী মাজিস্টর তা মনে মনেই ঠাওয়র পাইলেন। তার পরে মাত্র রূপলাল আর একজন কনেষ্ঠবলের সাক্ষী নিয়া, আরও যে অনেকে রাইমণির সন্ন্যাস রোগে মরণ আর দারগা সায়াবের উপ্‌রে হৈরার খামাখা রুইখা যাওয়নের কথা ঠিক ঠিক কৈবার আইচিল, উবুরন্ত ও অতিরিক্ত বৈলা হাকিম তাগোরে বেবাকেরেই কাচারির বাইর থিকাই বিদায় দিলেন।

দণ্ডেক কাল বইসা মাজিস্টর রায় লেইখ্‌লেন পরে আসামীরে যখন দুই বছর ফাটকের কথা পইরা শুনান হৈল, তখন তার মুখের ভাবের কিছুই বদল দেখা গেল না।

শ্রীসুরেশানন্দ ভট্টাচার্য্য।

বিদ্যাপতি।

—:*:—

পলিটিক্সের রঙ্গমঞ্চে পেট্‌রিয়টিজ্‌ম্‌ জিনিসটার যে-রকম মূল্যই থাক্‌ না কেন বাণীর মন্দিরে কিন্তু তার কোন আসন নেই। যদি বা থাকে ত সেটা নিতান্তই নীচু—আর একান্তই এক কোণে। এই পেট্‌রিয়টিজ্‌মকে সঙ্গে নিয়ে যদি আমরা বাণীর মন্দিরে প্রবেশ করি তবে বীণাপাণীকেই আমরা খাট কর্‌ব—আর তাতে সবার চাইতে সবার আগে ক্ষতি হবে পেট্‌রিয়টিজ্‌মেরই। আমরা যে আজকাল সময়ে অসময়ে সভাসমিতিতে ঘরে বাইরে সুযোগ পেলেই আমাদের বৈষ্ণব কবিদের সম্বন্ধে একটা আকাশ-পাতাল জোড়া মত প্রকাশ করি—বিশ্ব-সাহিত্যের মাঝে তাদের প্রত্যেকের জন্যে এক-একখানি হীরক-মুক্তা-খচিত রত্নসিংহাসন পেতে দিয়ে প্রশংসমান নেত্রে গদগদভাষে বলি—আঃ কি সুন্দর—এমন আর হয় না—এমন আর হবে না—হতে পারে না—সে-সবের মাঝে আমাদের পেট্‌রিয়টিজ্‌ম্‌ জিনিসটা কতখানি আছে তা জানি নে—কিন্তু তার মধ্যে যে এই পেট্‌রিয়টিজ্‌ম্‌ জিনিসটার একটা বড় রকম এলোপ্যাথিক ডোজ্‌ থাকার সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে—সেই কথাটাই এখানে ব'লে নেওয়া আমার উদ্দেশ্য।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই বৈষ্ণব কবিদেরই একজন—বিদ্যাপতির সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কর্‌বার ইচ্ছা করি। এই প্রবন্ধটী নিয়ে আমি

বিদ্যাপতিকে সার্টিফিকেট দিতে যাচ্ছি নে—সেটা ধৃষ্টতা বলেই মনে করি। বিদ্যাপতি যে কবি—একজন প্রকৃত কবি সে সম্বন্ধে বোধ হয় দু'মত নেই। বাস্তবিক—

শৈশব যৌবন দুহু মিলি গেল।
শ্রবনক পথ দুহু লোচন নেল॥
চৌঙকি চলয়ে ক্ষণে ক্ষণে চলু মন্দ।
মনমথ পাঠ পহিল অনুবন্ধ॥

কবরী ভয়ে চামরী গিরি-কন্দরে
মুখ ভয়ে চাঁদ আকাশে।
হরিণী নয়ন ভয়ে স্বর ভয়ে কোকিল
গতি ভয়ে গজ বনবাসে॥

সজনি ভাল করি পেখন না ভেল।
মেঘমালা সঞে তড়িত-লতা জনু
হৃদয়ে শেল দেই গেল॥

আধ আঁচল খসি আধ বদনে হাসি
আধ হি নয়ান তরঙ্গ।
আধ উরজ হেরি আধ আঁচর ভরি
তদবধি দগধে অনঙ্গ॥

নব বৃন্দাবন নবীন তরুগণ
নব নব বিকশিত ফুল।
নবীন বসন্ত নবীন মলয়ানিল
মাতল নব অলিকুল॥

—এ রকম আরও কতও আছে—এ সবের মধ্যে যে সুর ও সৌন্দর্য্য রয়েছে তা বাঙ্গালী হ'য়ে যিনি উপভোগ করতে পারেন নি তাঁর দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে বিদ্যাপতির পদাবলীর মূল কথা যেটা সেইটে নিয়ে একটু আলোচনা করা।

(২)

এমন অনেক সমালোচক আছেন যাঁরা বলেন যে বৈষ্ণব পদাবলী কুনীতি কুরুচি ও অশ্লীলতা পূর্ণ। সুতরাং এ-গুলোর কোন মূল্য নেই—বড় জোর এ-সব নিকৃষ্ট শ্রেণীর কবিতা। তাঁরা বলেন যে এই সকল কবিতার সংসর্গে এসে নরনারীর মন চঞ্চল ও অশুচি হ'য়ে ওঠবার সম্ভাবনা—তাতে সমাজের অমঙ্গল। অর্থাৎ এই সকল সমালোচক যখন কাব্য সমালোচনা করতে বসেন, তখন তাঁরা শুধুই কাব্য-সমালোচকই নন সেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা নীতিবিদ্‌ও বটেন আবার সমাজপতিও বটেন। আর আমাদের ত এটা চোখে দেখা যে Judicial Executive এক জনের হাতে থাকলে বিচারে ভুল হবার সম্ভাবনা পদে পদে। এই শ্রেণীর সমালোচকের বিচারটা কতকটা এই রকমের।

আসল কথা হচ্ছে এই পৃথিবীতে কেউই কবির dictator হতে পারে না—তা তিনি নীতিবিদই হন, সমাজপতিই হন, বা নবাব সিরাজদ্দৌলার নাতিই হন। কবির লেখায় যদি সমাজের অমঙ্গল হয় তবে সমাজপতি সে কবিকে কারাগারে রুদ্ধ করতে পারেন কিন্তু তাঁর দ্বারা নীতির তত্ত্ব লিখিয়ে নিতে পারেন না। কবি কি লিখবেন

তার উপরে সমাজপতি নীতিবিদের হাত ত নেইই খোদ কবিরও বড় বিশেষ নেই। কারণ কবিতার জন্ম যেখানটায় সেখানে কবির মনোময় পুরুষ পৌঁছিতে পারে না। কবির যেখানে এই কবিতার জন্ম হচ্ছে সেখানটা কুনীতি সুনীতি, শ্লীল অশ্লীল জুড়ে বসে নেই—সেখানটা জুড়ে বসে আছে সত্য ও আনন্দ। যখন সেই জগৎ থেকে আনন্দের ঠেলা খেয়ে সত্য, সুর ও সৌন্দর্য্যকে সঙ্গে নিয়ে কবির মনোরাজ্যে নেমে আসে, তখন কবি বসে যান তাতে শব্দ যোজনা করতে—আর তখনই আমরা পাই কবিতাকে। কবি তখন দেখে সত্যকে, পায় সৌন্দর্য্যকে, অনুভব করে আনন্দকে। শ্লীল অশ্লীল কুনীতি সুনীতি প্রভৃতি কথা ভাববার অবসরই নেই তখন তার। সে তখন এমন একটা জগতে, যে-জগতটা এই অজ্ঞান ও বদ্ধ পৃথিবীর চাইতে মুক্ততর, সত্যতর, দীপ্ততর। আর এই পৃথিবী দিয়ে সেই সত্যময় আনন্দময় জগতটাকে শাসন করবার চেষ্টাটা আমাদের ডন্ কুইক্‌সোট্ ও স্যাঞ্চো পাঞ্জারই কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে যায়। কাজেই নিরঙ্কুশা হি কবয়ঃ—সে-কালেও এ-কালেও ব্যাকরণেও আচরণেও।

অপর পক্ষে আবার আছেন কৃষ্ণভক্ত পরম বৈষ্ণবেরা। তাঁরা আমাদের দিকে চোখ রাঙিয়ে বলবেন—সাবধান লেখক—এ সব পদাবলী নিয়ে খেলা নয়। এ সব হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন লীলা—অমূল্য রত্ন—এ সবের উপরে কলম চালাতে যেও না—সাবধান! আমরা বলব রাধাকৃষ্ণের লীলা বটে কিন্তু লেখা মানুষের। কৃষ্ণভক্ত বলবেন—মানুষ, সে কি সাধারণ মানুষ! তাঁরা ছিলেন সব ভক্তশ্রেষ্ঠ পরম সাধক! আমরা উত্তরে বলব যে—পরম সাধক হলেই চরম

সাহিত্যিক হয় না—শ্রেষ্ঠ ভক্ত হলেই উৎকৃষ্ট কবি হয় না। আসল কথা হচ্ছে যে রাধাকৃষ্ণ বড় মহাজন বটে কিন্তু সেই বড় মহাজনের নামের ছাপ মেরে সাহিত্যের বাজারে আমরা কোন মালই বিনপরখে চালিয়ে নিয়ে যেতে দেব না। বড় লোকের হাতে আংটী থাকলে সাধারণ লোকে সেটাকে সোনার আংটী বলে' মনে করুক কিন্তু যে স্বর্ণকার তাকে দেখতে হবে পরীক্ষা করে', সে-আংটী বাস্তবিক সোনার না পিতলের।

গৌরাঙ্গভক্ত পরম বৈষ্ণবের পায়ের ধুলো নিয়ে আমরা জীবন কৃতার্থ মান্‌তে পারি এবং তিনি যখন মৃদঙ্গ দেখে ভাবে আত্মহারা হয়ে অশ্রু বর্ষণ করেন তখনও কারও আপত্তি করবার কারণ ঘটে না। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের বিচারকালে যদি তিনি বলে' বসেন যে, সকল বাদ্য-যন্ত্রের সেরা বাদ্যযন্ত্র হচ্ছে মৃদঙ্গ তখন তাঁর সঙ্গে তর্ক লাগবেই—তখন আমাদের বল্‌তেই হবে যে বাদ্যযন্ত্র হিসাবে বীণার স্থান মৃদঙ্গের চাইতে অনেক উঁচুতে—তা তিনি আমাদিগকে গালাগালিই দিন, ভক্তিহীন নরাধমই বলুন আর যাই করুন।

(৩)

এতক্ষণ এক রকম ভূমিকাতেই কেটে গেল। এইবার আসল কথা পাড়ব।

বলেছি যে বিদ্যাপতির পদাবলীর আসল কথাটা নিয়ে একটু আলোচনা কর্‌ব। এই আসল কথাটা কি? সেটি হচ্ছে প্রেম—মধুর প্রেম। প্রমাণ,—এতে পূর্ব্বরাগ, অভিসার, বিরহ, মিলন ইত্যাদি

মধুর প্রেমের যা কিছু আনুষঙ্গিক সব আছে। এখন একটা প্রশ্ন করা যেতে পারে এই যে—প্রেম ত বোঝা গেল—কিন্তু কার প্রেম?

যাঁরা একটু আধ্যাত্মিক ছাঁচের লোক তাঁরা অত্যন্ত গম্ভীর হ'য়ে বল্‌বেন যে এ-প্রেম পরমাত্মার সঙ্গে জীবাত্মার—যাঁরা একটু পৌরাণিক ধাঁচের তাঁরা নিতান্ত আশ্চর্য্য হয়ে ভাববেন—কার প্রেম? এ প্রশ্ন আবার ওঠে কেন! স্পষ্টই ত লেখা রয়েছে এ সব রাধা-কৃষ্ণের প্রেম। এঁরা দু' দলই হয়ত ঠিক। কিন্তু আমরা হচ্ছি সাধারণ লোক—আমরা বল্‌ছি যে এ প্রেম জীবাত্মা পরমাত্মারও নয়, রাধাকৃষ্ণেরও নয়—এ প্রেম হচ্ছে বিদ্যাপতির নিজের। বিদ্যাপতির যে পদাবলী তার প্রত্যেক লাইনটীর প্রত্যেক শব্দটীর প্রত্যেক সুরটীর পিছনে রয়েছে বিদ্যাপতির অনুভব—বিদ্যাপতির দৃষ্টি—বিদ্যাপতির আনন্দ। এক কথায় বিদ্যাপতির পদাবলীর পিছনে রয়েছে মানুষেরই হৃদয়ের স্পন্দন—মানুষের অনুভবেরই অনুবাদ। আর সেই জন্যেই এ সব পদাবলী রাধাকৃষ্ণের নাম করে' চিরকাল মানুষকে ফাঁকি দিয়ে যাওয়া শক্ত। কারণ প্রেম জিনিসটা সম্বন্ধে সব মানুষেরই বেশী কম অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু সেটা ধীরে ধীরে আস্‌ছে।

এখন দ্বিতীয় প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে যে বিদ্যাপতির প্রেম হোক্ - কিন্তু কার প্রতি প্রেম সেটাও ভাবা উচিত। আমরা বলি যে তার কোনই দরকার নেই। কারণ কাব্যে প্রেম কতখানি মহীয়ান গরীয়ান সত্য হ'য়ে উঠ্‌বে তা কবি কাকে ভালবেসেছেন তার উপরে নির্ভর করে' না মোটেই। নির্ভর করে এর উপরে যে কবি কেমন ভালবেসেছেন—আর তার কতখানি আত্মপ্রকাশকের ক্ষমতা—তাঁর প্রতিভার ওজনই বা কত। রজকিণীকে ভালবেসেও চণ্ডীদাস প্রেমের মহীয়ান্ রূপের দর্শন পেলেন—আর

সেটা ঐ উপরে যা বলা গেল তারি সত্যতা প্রতিপন্ন করছে বলেই মনে করি। আসল কথা হচ্ছে এই যে মানুষের যে প্রেম তা ভগবানের প্রতিই হোক্ বা মানুষের প্রতিই হোক্ দুইই তাকে এক রকম অমৃতই মিলিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। কারণ প্রেমের যে অমৃত মিলিয়ে দেবার ক্ষমতা সেটা ভগবানেও নেই—প্রেমপাত্র ও প্রেম-পাত্রীতেও নেই—সেটা আছে প্রেমের মধ্যে—প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম অনুভব করবার শক্তির মধ্যে—তাদের প্রেমানুভূতির গভীরতা ও একনিষ্ঠতার মধ্যে। সুতরাং বিদ্যাপতির প্রেম শ্রীকৃষ্ণের প্রতি না শিবসিংহের অন্তঃপুরবাসিনী কোন কিশোরীর প্রতি তা নিয়ে মাথা ঘামাবার আমাদের দরকার নেই। আমরা দেখতে চাই তাঁর কাব্যে আমরা কি পাই। আর সে জন্যে বৈষ্ণব কবিদের আলোচনা কালে এ কথাটা আমাদের মনে রাখা খুব দরকার যে আধ্যাত্মিক-যোগ সাধনা আর কাব্য-রচনা এক কথা ত নয়ই—এ দুয়ের এক প্রথাও নয়। কারণ কাব্য-রচনাটা এক প্রকারের সাধনা বলে' মেনে নিলেও সব রকমের সাধনাই যে কোন প্রকারের কাব্য তা স্বীকার করতে পারে তারাই যাদের মস্তিষ্ক আর হৃদয়টা ঠিক্ অ্যানাটমির নিয়ম রক্ষা করে' সৃষ্ট হয় নি।

বৈষ্ণব কবিদের কথা উঠ্‌লেই যে আমরা "আধ্যাত্মিক" "যোগ-সাধনা" ইত্যাদি ইত্যাদি কতগুলো বাঁধিগৎ আওড়িয়ে তাঁদের কাব্যের চার পাশে একটা Mystery-র কুয়াশা সৃষ্টি করি সেই কুয়াশা কতকটা দূর করবার প্রয়াসেই উপরের অতগুলো কথা বলা গেল—নইলে কথাগুলো বোধ হয় অবান্তর। যা হোক্ এখন বিদ্যাপতির পদাবলীর আসল কথাটার দিক থেকে একটা মূল্য দেখতে চেষ্টা করব। এই আসল কথাটা হচ্ছে মধুর প্রেম।

(৪)

বিদ্যাপতির কাব্যের একটা সঠিক মূল্য নির্দ্ধারণ করতে গেলে তাঁর একটী কবিতাকে বাদ দেওয়া দরকার। সেটী হচ্ছে সেই সর্ব্বস্থানে সর্ব্বজনোদ্ধৃত কবিতাটী—

সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সেহ পীরিতি অনুরাগ বাখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥
জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সেহ মধুর বোল শ্রবনহি শুনলু
শ্রুতি পথে পরশ না গেল॥
কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়িনু
না বুঝনু কৈছল কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়া জুড়ল না গেলি॥ ইত্যাদি॥

এ-কবিতাটী বাদ দেওয়া দরকার এই জন্যে যে এটী দিয়ে বিচার করতে গেলে বিদ্যাপতির কাব্য সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণাই হবার সম্ভাবনা। কারণ এ কবিতাটী বিদ্যাপতির অন্যান্য পদাবলী থেকে এত বিভিন্ন—এত উঁচুতে যে হঠাৎ মনে হয় এটা বুঝি প্রক্ষিপ্ত। এই কবিতাটী দাঁড়িয়ে উন্নতশিরে বিদ্যাপতির বিরুদ্ধে সাক্ষী দিচ্ছে। বলছে—দেখ দেখ—আমি কি হতে পারতেম—অথচ কি হই নি—আর সে দোষ বিদ্যাপতি ঠাকুরের। আমার মনে হয় এই কবিতাটীতে

চণ্ডীদাসের ভাব বিদ্যাপতির ভাষার পোষাকে একেবারে নিখুঁত সুন্দর হ'য়ে ফুটে উঠেছে।

এ কবিতাটী পড়ে আমাদের অন্তরে যে ছবি ফুটে ওঠে সে এ-লোকের নয়—সেটা স্বলোকের। মানুষের অন্তরে যে একটা প্রেমের এম্‌নি পারাবার আছে যার তল সে নিজেই বুঝে উঠ্‌তে পারে নি তার পরিচয় এ কবিতার প্রত্যেক ছত্রে আছে। এই গ্রামটায় আমরা প্রেমের যে সুর শুন্‌তে পাই সে-সুর বোধ হয় কতকটা পরিমাণে আর একটা কবিতায়ও আছে—সেটা হচ্ছে সেই যার আরম্ভ "আজু রজনা হাম ভাগ্যে পোহায়নু পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দ" দিয়ে। কিন্তু এ ছাড়া বিদ্যাপতির আর যে-সব পদাবলী তার জন্ম প্রেমলোকে হয় নি—তার জন্ম হয়েছে কামলোকে।

কথাটা শুন্‌তে বোধ হয় একটু কড়া শোনায়—কিন্তু উপায় কি? যখন পড়ি—

কি লাগি বদন ঝাঁপসি সুন্দরী
হরল চেতন মোর।
পুরুখ বধের ভয় না করহ
এ বড়ি সাহস তোর॥ ইত্যাদি

তখন এ-সব পদের ভিতর দিয়ে বিদ্যাপতি ঠাকুরের হৃদয়-প্রেমের কোন ধারা আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে', যায় না—আমাদের মনে অন্য রকমের ছবি ফুটে ওঠে। হাফেজের একটী কবিতা আছে—

ছড়ায় রাজার পথে তারা
মণি মুক্তা কতই না জানি;

আমি কিন্তু মোর প্রিয়া লাগি
আঁখিতে বাঁধাব পথ খানি।

তবুও এ অনুবাদ—কিন্তু এর পিছনে হাফেজের যে একটা অনুভবের অনুভব আমরা পাই বিদ্যাপতির কাব্যে তা কোথাও পাই নে—অবশ্য বলেছি ঐ একটী কবিতা ছাড়া যেখানে বলা হয়েছে যে সে-প্রেমের ব্যাখ্যান কর্‌তে "তিলে তিলে নূতন হোয়"। কেউ কেউ মনে কর্‌তে পারেন যে আমি আমার মত সমর্থন কর্‌বার জন্যে খুঁজে খুঁজে বহু কষ্টে ঐ একটী পদ বের করে' এখানে লাগিয়ে দিয়েছি। কিন্তু যাঁদের বিদ্যাপতির কাব্যের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁরাই জানেন যে তাঁর পদাবলীতে আগা থেকে গোড়া পর্য্যন্ত হৃদয়ের কথার চাইতে হৃদয়জের ব্যথাই বেশী। আর হৃদয়জ জিনিসটা প্রেমলোকের গানের বিষয় নয়—সেটা হচ্ছে কামলোকের ধ্যানের বস্তু।

দেশী বিদেশী অনেক প্রেমিক-কবির কবিতা তুলে তার সঙ্গে তুলনা করে' বিদ্যাপতির প্রেমের গানের যে কি পার্থক্য তা দেখান যেতে পারে কিন্তু তাতে পুঁথিই বেড়ে যাবে আর তার দরকারও নেই। কেননা বিদ্যাপতির কাব্য নিজ গুণেই স্বপ্রকাশ হ'য়ে আছে—তা বুঝবার জন্যে আর কারও কাছে যাবার দরকার নেই। বিশেষতঃ প্রেম জিনিসটা এমন একটা দ্রব্য যার গুণ সম্বন্ধে সব মানুষেরই অল্প বিস্তর অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতাটা একবার খতিয়ে দেখবার চেষ্টা করা যাক।

একাল পর্য্যন্ত মানুষ প্রেমের তিনটী রূপের দর্শন লাভ করে' এসেছে। প্রথমটী হচ্ছে—নিছক কাম। এতে নাসিকা কুঞ্চিত

করবার কিছু নেই। কারণ এও একটা ভগবান-সৃষ্ট সত্য। এর প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মানুষের ইন্দ্রিয়ের উপরে—তার দেহের অণু-পরমাণুর যে চৈতন্য তার উপরে—তার অন্নময় কোষের instinct-এর উপরে। এও এক প্রকারের প্রেম। এ প্রেমের আনন্দ অতি পরিমিত, অতি সীমাবদ্ধ—কেননা অন্নের সীমা আছে আর সেইজন্যই এটাকে আমরা নিকৃষ্ট প্রেম বলি—কারণ মানুষকে এর আনন্দ দেবার ক্ষমতা অতি কম। এই প্রকারের প্রেমেই জন্মেছে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর, বায়রণের ডন্ জুয়ান, বোকাচ্চয়োর ডিক্যামেরন। দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে কাম এবং প্রেমের একটা কেমিকেল কম্পাউণ্ড গোছের। এইটী হচ্ছে বিশেষ করে' মানবীয় প্রেম। সাধারণতঃ মানুষের অন্তরে কাম ও প্রেম এমনি ভাবে জড়াজড়ি করে' থাকে যে এর একটাকে বাদ দিয়ে আর একটাকে প্রায় সে বুঝতেই পারে না। মানুষের অন্তরে এই প্রকার প্রেমের মধ্যে কামের ডোজ যত কমে আস্‌তে থাকে আর প্রেমের ভাগ যত বেড়ে যেতে থাকে তার আনন্দের অনুভবও তত পরিপূর্ণতর হতে থাকে। কেননা কামই মানুষের সীমা দেয়—কামই মানুষকে সকাম করে' তোলে—আর মানুষ সকাম যেখানে সেখানে তার দুঃখের চাইতে সুখ কম—অমৃতের চাইতে অশান্তি বেশী। এ প্রেমের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে। তাই এ প্রেমের আনন্দেরও সীমা আছে। কারণ মানুষের হৃদয় ক্ষুদ্র না হলেও তা অসীম নয়।

এ দুই প্রকার ছাড়া তৃতীয় রকমের এক প্রেম আছে যেটা মানুষ সাধারণ ভাবে অনুভব না করলেও অসাধারণ ভাবে মাঝে মাঝে তার খবর সে পেয়েছে। সেটা হচ্ছে নিছক বিশুদ্ধ প্রেম। এই প্রেমের অনুভবেই অমৃত—এ প্রেমের আনন্দের পূর্ণতা বাইরের মিলনকে

উপেক্ষাও করে না—আবার তার অপেক্ষাও রাখে না—এ প্রেম স্বরাট, যা নিজগুণেই মানুষকে অমৃত পাইয়ে দেয়। এ প্রেমের মানুষকে অমৃত পাইয়ে দেবার ক্ষমতা অসীম—কারণ এ প্রেমের প্রতিষ্ঠা সেইখানে যেখানে মানুষের সীমা নেই। কেউ কেউ হয়ত বল্‌বেন যে আমি বাজে বক্‌ছি—বড় জোর একটা থিওরির সৃষ্টি কর্‌ছি। এর ছাপাই স্বরূপ বল্‌ছি যে এই প্রকার প্রেমের ইঙ্গিতই চণ্ডিদাসের পদাবলীতে অনেক খানে আছে—অবশ্য তাও অনেক স্থলেই তত্ত্ব হিসেবে—কাব্য হিসেবে নয়। কারণ একথা আজকাল সবাই মানেন যে তত্ত্বকথা পদ্যে গাঁথলেই তা কাব্য হ'য়ে উঠতে বাধ্য নয়।

এই যে তৃতীয় রকমের প্রেম এইটে হচ্ছে উত্তম প্রেম। কারণ এ প্রেমের অনুভব যখন মানুষ পায় তখন তার পূর্ণ আনন্দ—তখন তার প্রেমে দুঃখের লেশমাত্র থাকে না। কারণ এ প্রেমে ব্যর্থতার স্থান নেই—কেননা এ প্রেমের অনুভবের মধ্যেই মিলন রয়েছে—আর তার কারণ হচ্ছে এই যে দৈহিক মিলনটা যতটা স্পষ্ট ততটা সত্য নয়। আর প্রেমের সত্য ধর্ম্মই হচ্ছে মানুষকে আনন্দ দেওয়া—দুঃখ দেওয়া নয়। এ প্রেম উত্তম প্রেম কারণ এ প্রেমের আনন্দ দেবার ক্ষমতাও অসীম—কেননা বলেছি এর প্রতিষ্ঠা অন্নে নয়—অন্নের সীমা আছে—মানুষের হৃদয়েও নয়—হৃদয়ও অসীম নয়—এ প্রেমের প্রতিষ্ঠা তার চাইতেও ঊর্দ্ধলোকে। এ প্রেম সীমাকে আশ্রয় করে' অসীমে উন্মুক্ত হয়েছে—এ প্রেম রূপকে জড়িয়ে অরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছে—তাই এ প্রেমে অন্ন পরিত্যক্তও হয় নি আবার তার আধিপত্যও রয় নি—ইন্দ্রিয়াদি মুছেও যায় নি আবার তার বন্ধনও

পড়ে নি—এই হচ্ছে সীমার মধ্যে অসীমের খেলা—রূপের মাঝে অরূপের প্রকাশ। আর এই হচ্ছে মানুষের আসল সত্যময় রহস্যটী যা দিয়ে সে তৈরি।

এখন আমরা প্রেমের কবিতার মধ্যে চাই এমন কতগুলো কথার সমষ্টি—এমন একটা সুরের ব্যঞ্জনা—এমন একটা ভাবের সঙ্গীত যার ভিতর দিয়ে আমরা খবর পাব এই উত্তম প্রেমের। কারণ ঐ দিকেই আমাদের গতি—ঐটেই যে আমাদের সত্য আর ঐটেই যে আমাদের অপ্রাপ্ত। যেটার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে পরিচয় নেই—সেটার খবর আমরা পেতে চাই কবির অন্তরের ভিতর দিয়ে। কারণ কবি অন্যান্য লোক থেকে কিছু অসাধারণ। আমরা সাধারণ মানুষ যে লোকে যেতে পারিনে কবি সেখানে হামেশাই যাওয়া আসা কচ্ছেন। সুতরাং প্রেমের উৎকৃষ্ট গান বল্‌ব সেই সবকে যা আমাদিকে এই উত্তম প্রেমের অনুভব কতকটা করিয়ে দিতে পারে। আর যে গান যত বেশী করে'—যত গভীর করে'—যত স্পষ্ট করে' ঐ ভাব আমাদেকে অনুভব কারয়ে দিতে পার্‌বে সে-গানকে আমরা তত উচ্চে আসন দেব। আর বিদ্যাপতির কাব্যে—বলেছি ঐ একটি কবিতায় ছাড়া—ঐ জিনিসটী আমরা পাই নে—অবশ্য সেটা জোর করে' বল্‌ছি নে—সেটা বল্‌ছি দুঃখ করে'।

বিদ্যাপতির হ'য়ে কেউ কেউ একটা কথা বল্‌তে পারেন যে যেখানে মধুর প্রেমের ভিতর দিয়ে আত্মায় আত্মায় মিলন হয়েছে সেখানে ত দেহের মিলন ঘটবেই—সেখানে ত পরস্পরের চোখে পরস্পরের দেহ সুন্দর হয়ে উঠ্‌বেই—সেই রহস্যই ত বিদ্যাপতির কাব্যে আমরা পাই। সত্যি কথা—আত্মার মিলন হ'লে দেহের মিলন হবেই। কিন্তু যখন

কাব্যে দেহের মিলনটাই প্রধান বক্তব্য বিষয় হ'য়ে ওঠে এবং আত্মার মিলনের সন্ধানও পাওয়া যায় না—তখনই মুস্কিলের কথা। কারণ প্রেমিক লেখক যেখানে আত্মার মিলনের ভিতর দিয়ে দেহের মিলনে এসে পৌঁছেচেন পাঠক সেখানে দেহের মিলনের গান শুনে আত্মার মিলনে পৌঁছিতে পারে না। কেননা দেহ আত্মাকে গড়ে নি—আত্মাই দেহের জন্ম দিয়েছে। সুতরাং আত্মার সঙ্গে সঙ্গে দেহ এলেও—দেহের সঙ্গে সঙ্গে আত্মাকে পাওয়া যায় না।

ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পড়ে' যে বিদ্যা বা সুন্দরের অন্তরের প্রেমের কোন রূপ আমাদের মানস-চোখে ফুটে ওঠে না—সেটা সবাই একবাক্যে স্বীকার কর্‌বেন—কিন্তু বিদ্যাপতির পদাবলীর সম্বন্ধে যে মতভেদ হয় তার কারণ আমার মনে হয়—রাধাকৃষ্ণ নামের পুরাতন মাহাত্ম্য আর আমাদের মনের সনাতন জড়ত্ব। রাধাকৃষ্ণের নামের সঙ্গে এমন কতগুলো association of ideas আমাদের মনে আছে যে রাধাকৃষ্ণের নাম পেলেই সেটাকে আমরা সেই সব "ideas"-এর আতসীকাঁচের ভিতর দিয়ে দেখি—নইলে দশ জনের চোখে খেলো হ'য়ে যাওয়ার আশঙ্কাও যে একটু না আছে তাও নয়। রামায়ণ পাঠ হচ্ছে। বিশল্যকরণি না চিন্‌তে পেরে মহাবীর হনুমান সমস্ত গন্ধমাদনটাকেই নিয়ে যাবার মতলব আট্‌ছেন। এক নিরক্ষরা যুবতী কেঁদেই আকুল। তার পার্শ্ববর্ত্তী সঙ্গিনী জিজ্ঞেস কর্‌লে—"ওলো কাঁদিস্ কেন?" যুবতী বল্‌লে—"আহা কি কষ্ট।" সঙ্গিনী আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞেস কর্‌লে—"কার কষ্ট?" যুবতী উত্তর দিলে—"কেন! সীতার।" সঙ্গিনী বল্‌লে—দূর, এ যে হনুমানের কথা হচ্ছে।" "যুবতী তখন চোখ মুছে বল্‌লে—"ওমা আমি মনে

করেছিলুম বুঝি সীতার বনবাস হচ্ছে।" এও যেন কতকটা সেই রকম।

যা হোক শেষে বক্তব্য হচ্ছে এই যে বিদ্যাপতির কাব্যকে যখন প্রেমের দিক থেকে দেখি তখন তাঁর সমস্ত পদাবলীগুলো পাঠ শেষ হয়ে গেলে দীর্ঘ-নিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে একটা কথাই খালি মনে জাগতে থাকে—সে কথাটা হচ্ছে—"পিতল কাটারি কামে নাহি আওল উপরহি ঝিকি-মিকি সার।" তবু যে বিদ্যাপতিকে একজন প্রকৃত কবি বলি তার কারণ হচ্ছে যে তিনি যে গান গেয়েছেন তা সুন্দর ও মিষ্টি। আর অস্কার ওয়াইলডের এই যে কথা—

There is no such thing as a moral or immoral book ; books are well written or badly written that's all.

এ কথাটা নিতান্ত বাজে কথা নয় বলেই মনে করি।

(৫)

এখন যারা

তিন বাণে মদন জিতল তিন ভুবন
অবধি রহল দউ বাণে
বিহি বড় দারুণ বধিতে রসিক জন
সোঁপল তোহার নয়ানে॥

কিম্বা

কামিনী করই সিনান।
হেরইতে হৃদয়ে হানল পাঁচ বাণ॥

কিম্বা

ঝাঁপবি কুচ দরশয়েবি কন্দ।
দৃঢ় করি বাঁধিবি নীবিহক বন্ধ॥

ইত্যাদি পদে একটা ভীষণ আধ্যাত্মিক অর্থের ও তত্ত্বের সন্ধান পান তাঁদের কেউ কেউ আমাকে সম্বোধন করে' যে একটা কথা বলবেন তা জানি। তাঁরা বল্‌বেন—হে মূর্খ লেখক! তুমি বিদ্যাপতির কিছুই বোঝ নি। তাঁর কাব্যে যে একটা আধ্যাত্মিক জীবনের পূর্ণ রহস্য—যে একটা গভীর যোগসাধনের ধারা ইত্যাদি ইত্যাদি। তা তাঁরা যদি বিদ্যাপতির কাব্যকে যোগশাস্ত্র বলে চালাতে চান তা চালান—তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে তাতে সাহিত্যের আসরে বিদ্যাপতির গৌরব কম্‌বে বই বাড়্‌বে না—অন্ততঃ আমার ত তাই বিশ্বাস।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

বাজে তর্ক।

[স্থান—হ্যারিসন রোডস্থ এক ত্রিতল বাটীর একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ। সময়—সন্ধ্যা প্রায় সাড়ে ছটা। শচীন্দ্রকুমার ও তাহার বন্ধু অমিয় চৌকিতে উপবিষ্ট। উভয়েই তরুণ বয়স্ক যুবক। শচীনের চেহারাতে নির্ভীকতা, তেজস্বিতা ও সরলতার বেশ একটু আভা আছে। অমিয় একটু স্থূলকায় এবং তাহার চেহারা সাদাসিদে ভাল মানুষটির মত। দুই বন্ধুতে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।]

অমিয়। তোমার কাছে ফণীবাবুর সেই বইখানা আছে না, শচীন?

শচীন। হ্যাঁ আছে। পড়া হয়ে গেছে, চাই তোমার?

অমিয়। সেটা নিতেই তো এসেছি। আচ্ছা শচীন, সেদিন ফণীবাবুর সঙ্গে হরিদার কি তর্কই বেধে গেল। হাতাহাতি হয় আর কি! আমি না থামিয়ে দিলে ঠিক মারামারি হতো।

শচীন। হ্যাঁ, ফণীবাবুর অতটা তেতে ওঠা উচিত হয় নি। জানেই তো হরিদা একটুতে কি রকম চটে যায়, তার সঙ্গে এত তর্ক করা কেন? আর বিশেষ হরিদা বয়সে ঢের বড়, তাকে এতটা ক্ষেপিয়ে তুলে লাভ কি?

অমিয়। তুমি আর কথা ব'ল না। একবার তর্ক উঠলেই হ'ল, তার স্রোতে গা ভাসিয়ে কোথায় যে চলে যাও, তার ঠিকানাই পাওয়া যায় না।

[হরিদার প্রবেশ, তিনি অপর দুজনের অপেক্ষা বয়সে কিছু বড়। তাঁহার চুল সামনে ও পিছনে সমান ভাবে কাটা। শিরোপরি একটী শিখাও উঁকিঝুঁকি মারিতেছে।]

শচীন। এই যে হরিদা—আসুন।

অমিয়। অনেক দিন বাঁচবেন হরিদা। এইমাত্র আপনার কথাই হচ্ছিল।

হরিদা। তাই নাকি, আমার ভাগ্যি বলতে হবে। তা কি কথা হচ্ছিল শুনতে পারি কি?

শচীন। এমন কিছু না। আপনার সঙ্গে ফণীবাবুর সেই ঝগড়ার কথা বলছিলাম।

হরিদা। ঝগড়া আর কি? তবে যারা তর্ক করব বলে তর্ক করে, আর তর্ক করতে গিয়ে মেজাজ ঠিক রাখতে পারে না—তাদের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। ফণী তো কথা বলতেই জানে না।

অমিয়। (একটু হাসিয়া) সে দোষটা শুধু ফণীবাবুর কেন, অনেকেরই আছে।

হরিদা। ফণী বলে কি জান? আমাদের দেশের নাকি যা-কিছু সবি মন্দ। আমাদের ধর্ম্ম অচল, আমাদের সমাজের গঠন খারাপ, আমাদের স্ত্রীশিক্ষা নেই—এ সব অন্যায় কথা শুনলে কার না রাগ হয়, বল তো, অমিয়।

অমিয়। সে ত ঠিক কথা।

শচীন। না, ফণীবাবু এমন অন্যায়ই বা কি বলেছেন? আপনারা সব বলেন যে আমাদের দেশে খুব স্ত্রী-শিক্ষা আছে, কিন্তু কোথায় যে আছে তাত দেখতে পাইনে।

হরিদা। নেই? স্ত্রী-শিক্ষা নেই? আমাদের দেশে যেরূপ স্ত্রী-শিক্ষা, সেরূপ কোন্ দেশে তুমি দেখাতে পার?

শচীন। এইটে ঠিক কথা বলেছেন। আমাদের দেশে যেমন, এ রকম আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আমাদের দেশে গৃহলক্ষ্মীদের সঙ্গে সরস্বতীদেবীর যেমন মুখ দেখাদেখি নেই—তেমন বোধ হয় এক আফগানিস্থান ছাড়া আর কোথায়ও নেই।

হরিদা। তুমি নিতান্ত অর্ব্বাচীনের মত কথা বলছ, শচীন। শিক্ষা তুমি কাকে বল? যাতে মনের সদ্‌বৃত্তিগুলির বিকাশ হয় এবং চরিত্র গঠন হয়, তাই তো শিক্ষা। এদিক থেকে বিচার করলে দেখতে পাবে, আমাদের দেশের স্ত্রীলোক যত শিক্ষিতা এরূপ আর কোথাও নেই।

শচীন। কেবল মুখে বড় বল্‌লেই তো হয় না, কিসে বড় সেইটা আমাকে বুঝিয়ে দিন।

হরিদা। কিসে বড়? স্ত্রীলোকের যাহা প্রকৃষ্ট গৌরবের বিষয়—'মাতৃত্ব' তাতেই বড়। জান, কবি যা বলে গেছেন তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়—"ভায়ের মায়ের এত স্নেহ, কোথায় গেলে পাবে কেহ"—কোথাও না।

শচীন। সর্ব্বত্র গেলেই পাওয়া যাবে। "মা" হওয়াটা ভারতবর্ষের স্ত্রীলোকদেরি একচেটে নয়। আর এই যে আপনি বল্‌ছেন 'মাতৃত্বটা' আমাদের স্ত্রীলোকদের গৌরব, তা, ভাল-মা হবার উপযোগিতাই কি এদের আছে? শুধু বুকভরা স্নেহ থাকলেই ভাল-মা হয় না। পৃথিবীর ছোট-বড় নানা বিষয়ের ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি, যে মাতৃত্বের ভিতর নেই সে মাতৃত্বকে আমি বড় বল্‌তে পারিনে।

হরিদা। তোমার কাছে এক অভিনব কথা শোনা গেল। স্নেহ থাক্‌লে 'মা' হয় না, মাতৃত্বটা উঁচুদরের জিনিস নয়, বাৎসল্যটা মায়ামাত্র, অদ্ভুত বটে।

অমিয়। চটেন কেন, হরিদা? শচীনের কথায় দোষটা কি হল? সত্যিই তো, মনে করুন, যদি সন্তানের জ্বর হয়, সে ভাল জিনিস কিছু খেতে পায় না বলে, মা যদি একটি সন্দেশ লুকিয়ে খেতে দেন, তাহলে তার জ্বর-বিকার হতে পারে। শুধু স্নেহটা থাকলেই চলে না, আরও কিছু দরকার। আর ছোট ছেলেদের শিক্ষার ভার যদি রোজগারের খাটুনিতে শ্রান্তক্লান্ত পিতারি নিতে হয়, তবে মাতৃত্বের গর্ব্বটা অত করি কিসের?

হরিদা। শুধু স্নেহ থাকলেই সব হয়। 'মা' কখনও রুগ্ন সন্তানকে কুপথ্য দিতে পারেন না। তোমরা যে শিক্ষা শিক্ষা কর, শিক্ষা কাকে বলে, তাই তোমরা জান না। মানচিত্র খুঁজে কোথায় পোপোকেটিপেট্‌ল্ আছে তাই বের করার নাম শিক্ষা নয়; আর আকবর সাহের কটা হাতী ছিল—তা ঠিক না জানাটাই অশিক্ষা নয়।

শচীন। নিশ্চয়ই অশিক্ষা। পৃথিবীটা কি রকম, কোথায় কোন দেশে কি রকম লোক থাকে—এ সমস্ত না জেনে থাকা, আর ইচ্ছে করে অন্ধ হয়ে থাকা—একই কথা।

হরিদা। ওঃ, তোমরাই ভারি সব জান কিনা? তোমরা পৃথিবীর কটা খবর রাখ? কটা রাসায়নিক তথ্য তোমার জানা? দুপাতা ইংরেজী পড়েই মনে ভাব তুমি ভারী শিক্ষিত; ধরতে গেলে, তোমাতে আর ঐ কেষ্টাতে আমি কোন প্রভেদই দেখি না। তফাতের মধ্যে কেষ্টা ভৃত্য আর তুমি বিয়ে পাস।

অমিয়। আপনি কি বল্‌তে চান যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা আমাদের কোন উপকারে আসে না ?

হরিদা। আসে বৈকি ? এতে খুব অর্থ আসে। তা নিজে ঘরকন্না দেখে স্ত্রীকে অর্থসংগ্রহের চেষ্টায় পাঠাতে চাও তাকে খুব ঠেসে শিক্ষা দাও। কোন আপত্তি নেই।

শচীন। বাজে কথা বলেন কেন ? এই যে সব ছেলেরা মিল্‌টন, সেক্‌স্‌পীয়র প্রভৃতি বড় বড় কবিদের বই পড়ে, এতে করে কি তাদের মনের বিকাশ হয় না, বলতে চান ? শত শত বৎসর ধরে ইউরোপ যে সভ্যতা মনপ্রাণ দিয়ে গড়ে তুলেছে, তার পরিচয় পেয়ে আমাদের কোন লাভ হয় না ?

হরিদা। কাব্য-রসাস্বাদনের জন্য বহুদিন কষ্ট করে একটি বিজাতীয় ভাষা শেখবার কোন প্রয়োজন আছে বলে আমি বিবেচনা করিনে। তোমাদের ভবভূতি নেই, কালিদাস নেই, কৃত্তিবাস নেই, কাশীদাস নেই ? তোমরা নিজের সোনার অলঙ্কার ছেড়ে পরের গিল্‌টিকরা জিনিস পরতে এত লালায়িত হও কেন ? শত শত বৎসর ধরে ইউরোপ কি Civilization-এর চর্চ্চা করেছে ? তা কি তোমাদের হতাদর আর্য্যঋষিদের Civilization-এর পায়ের কাছে লাগে ? আমাদের সভ্যতা, আধ্যাত্মিক বৈজ্ঞানিক নয়।

শচীন। আচ্ছা মানলুম, তাহলে আমাদের দেশে যে বিজ্ঞানের বিশেষ চর্চ্চা হয় নি, তা ত স্বীকার করেন ? না তাও করেন না ?

হরিদা। না, তাও করিনে। যে দেশে ন্যায়-দর্শনের এত গভীর গবেষণা হয়েছে সেখানে যে বিজ্ঞানের চর্চ্চা হয় নি, এটা অসম্ভব কথা।

তা ছাড়া চর্চ্চা নেই তোমাকে বল্লে কে ? অঙ্কশাস্ত্র, রাসায়নিক শাস্ত্র এ সব তো আমাদেরি জিনিস।

শচীন। বটে ? আর এই যে রেলগাড়ী চড়ে যাতায়াত কচ্ছেন, ট্রামে চাপছেন, বৈদ্যুতিক আলো ও বাতাস ভোগ কচ্ছেন, এ সবও কি আপনাদের মহর্ষিরা দিয়ে গেছেন নাকি ?

হরিদা। দেখ শচীন, তুমি আমাকে যা বলবে বল, কিন্তু আর্য্য-ঋষিদের সম্বন্ধে কোন শ্লেষ প্রয়োগ ক'র না। তাঁরা তোমার ঠাট্টার পাত্র নন।

শচীন। রেখে দিন আপনার আর্য্যঋষিদের। তাঁরা করেছেন কি ? লোকালয় ছেড়ে এক পাহাড়ে গিয়ে বনে ধ্যান করেছেন ; তাতে লোকের কি এল গেল ? আর কাজের মধ্যে করেছেন এই যে বামুন, বৈদ্য, কায়েত, শূদ্র প্রভৃতি সমাজের নানা ভাগ তৈরি করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের যাতে চিরকাল একটা প্রভেদ থাকে, তার একটা পাকা বন্দোবস্ত।

হরিদা। পাশ্চাত্য শিক্ষার যে কি বিষময় ফল হয়, তা তোমাদের দেখেই বেশ বোঝা যায়। বর্ণভেদ নিয়ে যে এতটা চেঁচামিচি কর, বলি বর্ণভেদ নেই কোথায় ? ইউরোপে নেই ? তাদের মধ্যে বামুন যাদের পয়সা আছে, আর যে হতভাগ্য গরীব সেই শূদ্র, তাকে ছুঁলে তাদেরও জাত যায়। এ খবর রাখ ?

শচীন। সে বর্ণভেদ পৃথিবীর সর্ব্বত্র আছে, ভারতবর্ষও বাদ যায় না। আমাদের মধ্যে যার অর্থ বেশী তাকে সম্মান করিনে ? চির-কালই করে এসেছি—কলির ভাগ্যে আজই যে করি তা নয় বরং ধনীর মান্য আজকাল কমে আস্‌ছে। আমাদের মধ্যে আছে দোকর

জাতিভেদ—এক পয়সার, আর এক জাতের। পয়সার উপদ্রব মানুষমাত্রকেই ভোগ কর্ত্তে হবে, তাই করি, কিন্তু তার উপরে যে আর একটা হাতেগড়া দৌরাত্ম্য সহ্য করব, তা অসম্ভব।

অমিয়। যাক, তোমরা কি বাজে কথা নিয়ে তর্ক কচ্ছ, সন্ধ্যা-বেলা। তর্কে তোমাদের মধ্যে যে জিতবে, তারি মতে সায় দিয়ে পৃথিবীটা চল্‌বে এই ভেবে তর্ক বাধিয়েছ—না কি? আচ্ছা হরিদা, আপনি তো বামুন, আপনি কি মনে করেন যে আপনার খাবার সময়ে আমি ছুঁয়ে দিলে, আপনি আর বামুন থাকবেন না—একদম কায়েত হয়ে যাবেন?

হরিদা। এম্নি ছোঁও কিছু ব'লব না, কিন্তু সামাজিক ভাবে যখন আহার করব, তখন ছুঁলে আমাকে শাস্ত্রানুসারে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে।

শচীন। এই তো, এই জন্যেই তো আপনাদের সঙ্গে আমার লাগে। মিথ্যার উপর যে সমাজের ভিত্তি তা নিশ্চয়ই ধ্বংস হবে। সমাজ আমাকে বল্‌ছেন—তোমার যা ইচ্ছে যায় কর, বিলেত যাও, মুসলমানের হাতে খাও, সব কর—কিন্তু সামাজিক ভাবে জিজ্ঞেস করলেই বলা চাই, আমি কিছু করি নি তো! এ সব খুব ভাল, কি বলুন হরিদা?

হরিদা। তা ছাড়া, সমাজ কি করবে আর? লোক উচ্ছৃঙ্খল হবে, তা কি নেতারা এসে তাদের ধরে প্রহার করবে? মিথ্যা আচরণে কোনও দোষ নেই—উদ্দেশ্যটা যদি হয় খুব মহৎ।

শচীন। এটা আপনার নিতান্ত এড়োতর্ক। মিথ্যার সাহায্যে কোনও মহৎ উদ্দেশ্য কস্মিনকালে সিদ্ধ হয়ও নি, হবেও না। বিবেকানন্দ বলেছেন—

হরিদা। সব কথাতেই স্বামীজি, পরমহংসদেব এঁদের টেনে এন না। তোমার এই অভ্যাসটা বড় খারাপ। এঁদের কথা তুলতে তোমার একটুও সঙ্কোচ হয় না। এ অশ্রদ্ধার ভাবটা আমি মোটেই পছন্দ করিনে। স্বামীজি কি বলেছেন? তাঁর কথা তোমরা কেউ বোঝ? এটা দেখছি, ছেলেদের মধ্যে এক ফ্যাসান হয়ে দাঁড়িয়েছে—সবারি মুখে বিবেকানন্দের কথা। তাঁর 'বাণী' কেউ বোঝে না, কেবল কুতর্ক করবার জন্যে কতগুলি বুলি আওড়ায়।

শচীন। আপনারও এ রকম ত্রিকালজ্ঞ হবার ভাণটা কেউ ভাল বল্‌তে পারে না। ধর্ম্ম, স্বামীজি, পরমহংসদেব, সবি কি আপনার একলার? আর কেউ এ সম্বন্ধে কোন কথাই বলতে পারবে না?

হরিদা। পারবে না কেন—আমি কি নিষেধ করি? যার অধিকার আছে সেই পারবে, অনধিকার চর্চ্চা করা ভাল নয়।

শচীন। মানুষমাত্রেরই অধিকার আছে।

অমিয়। আপনারা কি কচ্ছেন, হরিদা? এই ফণীবাবুর বাড়ীতে এত তর্ক, আবার এখানে—কেন, এ রোগ কেন?

হরিদা। তর্ক আবার কি? যে যা খুসি বলবে আর সব নীরবে সহ্য করে যেতে হবে এ কোন কথা?

শচীন। সত্যিই তো, রাত হয়ে গেছে। কি রকম বাজে তর্ক করে সময়টা কেটে গেল। কিছু মনে করবেন না হরিদা, তর্কের মাথায় যা' তা' বলে ফেলেছি।

হরিদা। না, মনে কিছু করি নি, তবে তোমার আর একটু সংযত হওয়া উচিত। পাগলের মত তর্ক ক'র না আর কারু সঙ্গে। আচ্ছা, এখন তবে আসি।

শচীন। বসুন না, হরিদা, এখনি যাবেন কেন?

হরিদা। না পালাই, আমার কাজ আছে।

[হরিদার প্রস্থান]

অমিয়। আচ্ছা, কি নিয়ে সমস্ত সন্ধ্যেটা তর্ক করলে? তুমি আবার ফণীবাবুকে তার্কিক বলছিলে!

শচীন। উঃ, বেজায় গরম বোধ হচ্ছে। সন্ধ্যেটা কেটে গেল, চল গোলদীঘিতে একটা চক্কর দিয়ে আসি, তা না হলে ঠিক মাথা ধরবে। তুমি যা বলছ তা ঠিক, এদেশে তর্ক করে কোনও ফল নেই আর তর্ক ছাড়া করবারও আর কিছু ত নেই।

[উভয়ের প্রস্থান]

শ্রীকান্তিচন্দ্র সেন।